সোনায় বিনিয়োগ, ভবিষ্যতের সঞ্চয়

১৯৬৬ ২০২৩

৫৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বাজুস

BANGLADESH JEWELLER'S ASSOCIATION

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন

উপদেষ্টা সম্পাদক
রুহুল আমিন রাসেল

সম্পাদনা পর্ষদ
ডাঃ দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
মোঃ লিটন হাওলাদার
মিজানুর রহমান মানিক
মোঃ সেলিম
সজল মাহমুদ
মোঃ রোকন উদ্দিন
উত্তম কুমার পাল
রনজিৎ পাল
রাহুল সাহা
মোঃ নাজমুল হুদা লতিফ
বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ

সম্পাদনায়
খালেদ আকন
কে. এম. রাহাত ইসলাম

প্রচ্ছদ
গোলাম কিবরিয়া শাহীন

গ্রাফিক্স
জসিম আহম্মেদ

প্রকাশকাল
১৭ জুলাই ২০২৩

সম্পাদকীয়

১৯৬৬ সালের ১৭ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন - বাজুস।

এই সংগঠন আজ পা দিয়েছে ৫৮তম বছরে। ৫৭ বছরের পথচলা কখনোই মসৃণ ছিল না। তারপরও বাজুস সবসময় দেশের জুয়েলারি শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে।

আজ ৫৮তম বছরে এসে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সকল শুভানুধ্যায়ীদের যাদের নিরলস পরিশ্রমে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আজকের বাজুস।

"সোনায় বিনিয়োগ, ভবিষ্যতের সঞ্চয়" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাজুস উদযাপন করছে ৫৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। স্বল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা বাজুস আজ ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের বিশাল পরিবার।

শহরমুখি বাজুস আজ পৌছে গেছে গ্রাম অঞ্চলেও। এভাবে সবাইকে নিয়ে চলতে চাই আগামীর পথচলা।

BANGLADESH JEWELLER'S ASSOCIATION
বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন

প্রধান কার্যালয়:
লেভেল-১৯, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১০১২, হটলাইন: +৮৮ ০৯৬১২১২০২০২
ইমেইল: info@bajus.org, ওয়েবসাইট: www.bajus.org

সূচিপত্র

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩ ০৩
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ০৮
সোনায় বিনিয়োগ, ভবিষ্যতের সঞ্চয় ১০
যেভাবে বাজুসের যাত্রা ১২
স্বর্ণ কাহিনি ১৪
কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত জুয়েলারি শিল্প ১৮
ব্যাংকার থেকে জুয়েলারি ব্যবসায় ২০
অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ সময়ের দাবি ২২
বদলে গেছে ডিজাইন, কাস্টমারের চাহিদা ২৩
সব বাধা ছিন্ন করে ফুটব মোরা ফুটব গো ২৫
স্বপ্ন দেখি দিন বদলের ২৭
আমার পথচলায় বাজুস ২৯
এক অনন্য উচ্চতায় বাজুস ও ফিরে দেখা অতীত ৩০
অলংকার ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন নির্দেশিকা-২০২৩ ৩১
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল এন্ড মেম্বারশিপ ৩৬
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক মনিটরিং ৩৭
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ব্যাংকিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ৩৮
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ এন্ড ট্যাক্সেশন ৩৯
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং এন্ড প্রাইস মনিটরিং ৪০
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ৪১
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন এন্ড সোস্যাল অ্যাফেয়ার্স ৪২
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ৪৩
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এন্টি স্মাগলিং এন্ড ল এনফোর্সমেন্ট ৪৪
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এক্সিবিশন, ট্রেড এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ৪৫
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ওমেন অ্যাফেয়ার্স ৪৬
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইয়াং এন্টাপ্রেনার্স ৪৭
অর্থ কমিটি ৪৮

সায়েম সোবহান আনভীর
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

গুলজার আহমেদ
সহ-সভাপতি
০১৭১১৫৯০৩৭০

আনোয়ার হোসেন
সহ-সভাপতি
০১৭১৩০০৯৭৯১

এম এ হান্নান আজাদ
সহ-সভাপতি
০১৭১১৫৩০৪৭৫

বাদল চন্দ্র রায়
সহ-সভাপতি
০১৮১৯২১৭৭৭৭

ডাঃ দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
সহ-সভাপতি
০১৮৭৩৮৫৯৫০২

কাজী নাজনীন ইসলাম নিপা
সহ-সভাপতি

মোঃ রিপনুল হাসান
সহ-সভাপতি
০১৭১১৩০৮৮৮৫

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

দিলীপ কুমার আগরওয়ালা
সাধারণ সম্পাদক
০১৭১১৫৪৯৬৪০

মাসুদুর রহমান
সহ-সম্পাদক
০১৭১১৪৩৯৫৯৫

সমিত ঘোষ (অপু)
সহ-সম্পাদক
০১৭১৫৯৪০৩৭৫

বিধান মালাকার
সহ-সম্পাদক
০১৭১১৫২৭৪৭৫

মোঃ জয়নাল আবেদীন খোকন
সহ-সম্পাদক
০১৮৬৬৭৭৭৭৭৪

মোঃ লিটন হাওলাদার
সহ-সম্পাদক
০১৭১৫০১১২২৬

নারায়ন চন্দ্র দে
সহ-সম্পাদক
০১৭১৪০৪৭৭৬২

মোঃ তাজুল ইসলাম (লাভলু)
সহ-সম্পাদক
০১৭১১৫২৭২২৬

এনামুল হক ভুঞা লিটন
সহ-সম্পাদক
০১৭১৩০০৯৯৮৩

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

মুক্তা ঘোষ
সহ-সম্পাদক

উত্তম বণিক
কোষাধ্যক্ষ
০১৯২৬৭৬৭৬৭৬

ডা. দিলীপ কুমার রায়
সদস্য
০১৭১২০৬৬৯২৩

মোহাম্মদ বাবুল মিয়া
সদস্য
০১৮১৯২৪১৫২৫

মোঃ ইমরান চৌধুরী
সদস্য
০১৭১১৫৩২০০৮

পবিত্র চন্দ্র ঘোষ
সদস্য
০১৮১৭৫৭২৫৪০

আলহাজ্ব মোঃ মজিবর রহমান খান
সদস্য
০১৭১৩০১৩২৯৯

বাবলু দত্ত
সদস্য
০১৭১২১৬৬১৬২

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২১-২০২৩

মোঃ শহিদুল ইসলাম
সদস্য
০১৭১৩০৬৩৬৩০

জয়দেব সাহা
সদস্য
০১৮১৯২২০৯৭৭

ইকবাল উদ্দিন
সদস্য
০১৭১১৫৬৪৯৪০

কার্ত্তিক কর্মকার
সদস্য
০১৭১১৫৩৯৯৮৬

উত্তম ঘোষ
সদস্য
০১৭১১৫৩৩৬০৯

মোঃ ফেরদৌস আলম শাহীন
সদস্য
০১৯১১৩৮১৩৯৫

কাজী নাজনীন হোসেন জারা
সদস্য

মোঃ আসলাম খান
সদস্য
০১৭২৬২২২৯৪০

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

সৈয়দ শামসুল আলম হাসু

শামসুল আলম

আলী আকবর খান

সত্য রঞ্জন ব্রক্ষ্ম

কাজী সিরাজুল ইসলাম

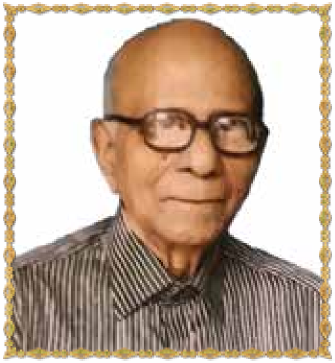

হরিপদ দত্ত

জগদীশ চন্দ্র সরকার

আলাউদ্দিন আহমদ

আফাজউদ্দিন খান

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

মোঃ খবির উদ্দিন

আঃ লাইছ

দিলীপ কুমার ঘোষ
সালেহ মোহাম্মদ
শাহাবুদ্দিন খান
মোঃ আশ্রাফউজ্জামান
হাজী শফিক আহমদ
আহমেদুর রহমান
জয়নুল আবেদীন
এ.কে.এম. শামসুল হক মিয়া
এস. এম জামাল
লিয়াকত আলী
এ.কে.এম ফজলুল হক
কানিজ ফাতেমা

বরুণ সরকার বাচ্চু
উপেন্দ্র চন্দ্র মন্ডল
আবদুর রশিদ
মোঃ ইয়াকুব
শম্ভুনাথ ঘোষ
আবুল কাশেম
মাধব চন্দ্র ঘোষ
মোঃ আমির উল্লাহ
আলহাজ্ব আবদুল মান্নান
এম. এ. মজিদ
মাহমুদ হারুন
কানাই চন্দ্র অধিকারী

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ছবি না পাওয়ায় ছাপা সম্ভব হয়নি।

সোনায় বিনিয়োগ, ভবিষ্যতের সঞ্চয়

সায়েম সোবহান আনভীর
প্রেসিডেন্ট, বাজুস

সোনার দাম বেশি, এ কথাটি আমি বারবার শুনছি। কিনতে গেলে দাম বেশি, বেচতে গেলে দাম কম। তাহলে কেনার সময় একটু বুঝে কিনি আমরা। আপনি যদি পিওর গোল্ড বা পাকা সোনা কেনেন, তাহলে বিক্রির সময় দামে খুব একটা পার্থক্য হবে না। সোনা কেনার সময় দেখতে হবে কীভাবে আপনি কিনছেন। জুয়েলারি যখন কিনবেন, তখন দেখবেন আপনার অলংকারে কী আছে। কাচের টুকরো, মিনা নাকি ডায়মন্ড আছে। অলংকারে মূল্য সংযোজন বা ভ্যালুয়েশন চিন্তা করে কিনতে হবে।

আমাদের সম্পদ হিসেবে সোনা কিনতে হবে। এ ক্ষেত্রে পাকা সোনা বা পিওর গোল্ড কেনা উচিত। ডায়মন্ড ভেবে কাচের টুকরো কিনলে সম্পদ হবে না। বরং আর্থিক ক্ষতি হবে। আপনি সোনা বা ডায়মন্ড জেনে কিনলে বিক্রির সময় দুঃখ থাকবে না। বাংলাদেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা সোনার দাম নির্ধারণ করেন না। সোনার দাম আন্তর্জাতিক বাজার লন্ডন বুলিয়ান মার্কেট বা এলবিএম থেকে নির্ধারণ করা হয়। সে আলোকে বাংলাদেশের সোনার বাজারে মূল্য নির্ধারিত হয়।

আমি মনে করি, বাংলাদেশে গত ২০ বছরে সোনার দাম অনেক বেড়েছে। যতটুকু মনে পড়ে আমার বিয়ের সময় বাংলাদেশে প্রতি ভরি সোনার দাম সাড়ে ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকার মতো ছিল। এখন ২০২৩ সালে এসে সেই সোনার দাম মানভেদে প্রতি ভরি বিক্রি হচ্ছে ৯৮ হাজার ৪৪৪ টাকা। ২০ বছরে কত গুণ বাড়ল সোনার দাম? সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করলে এটা পরিমাণে অনেক।

সম্পদ হিসেবে চিন্তা করলে আগামী ২০ বছর পর সোনার দাম কী হতে পারে? এখন প্রতি ভরি সোনার দাম ৯৮ হাজার টাকা। এটা ২০ বছর পর ৯ লাখ টাকাও হতে পারে। সোনা কিংবা অলংকারে বিনিয়োগ করলে এভাবেই চিন্তা করতে হবে। শুধু দাম বাড়ছে, এটা নিয়ে হতাশ হওয়া যাবে না। যারা আগে কিনেছেন, এটাও চিন্তা করতে হবে, তারা সবাই লাভবান হয়েছেন। এটাও ভাবতে হবে, সোনা কেনার সময় কম দামে কিনব, বিক্রির সময় বেশি দামে বিক্রি করব। এটাই সোনায় বিনিয়োগের লাভজনক পথ। পুরো বিশ্বে সোনা ও জমিতে বিনিয়োগ করে কোনো সময় ক্ষতি হয়নি। যিনি বুদ্ধিমান, যার কাছে অর্থ আছে তিনি জমি ও সোনায় বিনিয়োগ করতে পারেন। এর দাম গত ২০ বছরেও কমেনি। আগামী ২০০ বছরেও কমবে না। এ বিনিয়োগ ভবিষ্যতের সঞ্চয়।

এবার বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পায়ন নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। এ শিল্পের উন্নয়নে বাজুসের পক্ষ থেকে কিছু চাওয়া আছে। এটা খুবই সাধারণ। আমরা সবাই শিল্পের কথা বলি। কিন্তু আমরা কেন নতুন নতুন শিল্প করব? শিল্পকারখানা করার জন্য কিছু নীতি দরকার। এটা আমাদের সরকার চেষ্টা করছে। আমরা সরকারের উদ্যোগে সন্তুষ্ট।

অনেকে বলেন জুয়েলারি শিল্পে বাংলাদেশ কি ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে? তাদের কাছে আমার প্রশ্ন– আমরা তৈরি পোশাকশিল্পে কি ভারতকে ছাড়িয়ে যাইনি? বাংলাদেশ কিন্তু তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। আমরা জুয়েলারিতেও পারব। আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন। আমি নিজের চোখে দেখেছি বিদেশে অনেক বড় বড় জুয়েলারি আছে, সেখানে বাংলাদেশের লোকজন কাজ করেন। বাংলাদেশের মতো সূক্ষ্ম হাতের কারিগর দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এটা কিন্তু বোঝার ব্যাপার আছে।

বাংলাদেশের আরেকটি বড় ব্যাপার হলো, সোনা চোরাচালান। এটা করবে না কেন? দুবাই থেকে ব্যাগেজ রুলের আওতায় সোনার অলংকার আনলে ট্যাক্স ফ্রি। আবার আমদানিতে উচ্চহারে শুল্ক-কর আরোপ করে রাখা হয়েছে!

জুয়েলারি গহনা তৈরির কাঁচামালে আরও বেশি অস্বাভাবিক হারে করারোপ করা হয়েছে। সবাই একই কথা বলছেন, ট্যাক্স ফ্রি করে দেন তাহলে আর চোরাচালান হবে না। এটা চাইলেই তো হবে না। দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে সরকারকেও আমাদের সহায়তা করতে হবে। জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে কিছু কিছু বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- এনবিআরকে সহযোগিতামূলক চিন্তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

জুয়েলারি খাতে প্রায় ৪৪ লাখ মানুষ সম্পৃক্ত। আমরা সরকারের সহযোগিতা পেলে, সঠিকভাবে উৎসাহ ও কর প্রণোদনা পেলে এ শিল্প বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। অনেকে মনে করেন, জুয়েলারি কারখানা করতে না জানি কত টাকা লাগে! আমি মনে করি মাত্র ৫০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেও শুরু করা যাবে। কোনো কিছুই এক দিনে বড় হয় না। বটগাছ হতে কিছু সময় লাগে।

আমরা বসুন্ধরা থেকে যে জুয়েলারি কারখানা করছি, তাতে প্রাথমিকভাবে ৬ হাজার লোক কাজ করবে। আমাদের পরিকল্পনা, আগামী পাঁচ বছরে এ জনবল ৩০ হাজারে উন্নীত করা। আমরা ৬ হাজার দিয়ে শুরু করে ৩০ হাজারে যেতে পারলে ছয়জন দিয়ে শুরু করে ৬০ জনে যাওয়ার মতো ১ হাজার জুয়েলারি শিল্পকারখানা করা সম্ভব। জুয়েলারি খাতে এমন শিল্পায়ন হলে নতুন একটা দিকনির্দেশনা এসে পড়বে।

সরকার অনেক এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন করছে। এ শিল্পের জন্য একটা নিরাপদ জায়গা দরকার। তিন শ থেকে চার শ ব্যবসায়ী বলেছেন, ‘আমাদের একটা নিরাপদ জায়গা দেন’। আমি সরকারের কাছে দাবি জানাই ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আশপাশে একটা জায়গা দেওয়ার জন্য। মাত্র ১ হাজার একর জমি হলে জুয়েলারি পণ্য রপ্তানি করে তাক লাগানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি যেসব উদ্যোক্তা জুয়েলারি কারখানা করবেন, তাদের ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স ফ্রি সুবিধা দিতে হবে। এ সুবিধা পাওয়া গেলে সবকিছু লিগ্যাল ফরম্যাটে চলে আসবে।

আমাদের আইন সংস্কার না করলে কোনো দিনই বাংলাদেশে চোরাচালান বন্ধ হবে না। যে যত বড় বড় গানই গাই, যে যত বড় বড় কথাই বলি– আইন শিথিল করুন, ট্যাক্সেশন শিথিল করুন সবকিছু সোজা হয়ে যাবে। গার্মেন্টসের চেয়ে জুয়েলারিতে ভ্যালু অ্যাডিশন অনেক বেশি করা সম্ভব। আমার তো মনে হয় বাংলাদেশে ডিজাইনারের অভাব নেই। চারুকলার ছেলেমেয়েরা এত সুন্দর, নিখুঁত কাজ করেন, কিন্তু আমরা তাদের উৎসাহ দেই না। দেশের মানুষকে সঠিক কাজে লাগাতে পারছি না।

বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়িও বলা হয়েছে। আজকে আমরা তলাবিহীন ঝুড়ি না। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় চিন্তায় পড়ে গেল এ দেশের মানুষ, খাবে কী? আজ কিন্তু ১৮ কোটি মানুষ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ। সব দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। এ লক্ষ্যে আইন ও নীতিমালা ঠিক করতে হবে। করব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। সবকিছু সমাধান করা সম্ভব। এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট আশাবাদী।

যেভাবে বাজুসের যাত্রা

সত্য রঞ্জন ব্রহ্ম
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বাজুস

ঢাকা শহরে জুয়েলারি ব্যবসা করতে গিয়ে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে ১৯৬৬ সালের ১৭ জুলাই জুয়েলার্স সমিতি গঠন করেছিলেন বাবু কালীদাস বৈদ্য। কোনো সংগঠন একা পরিচালনা করা যায় না তাই তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বাবু সুশীল মালাকারসহ কয়েকজন জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে। সেই শুরু 'ঢাকা জুয়েলার্স সমিতি'র। সমিতি গঠনের দুই বছর পর ডা. কালীদাস বৈদ্য রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার কারণে ১৯৬৮ সালে বাজুসের সভাপতির দায়িত্ব পালন থেকে সরে যান। তখন নিউমার্কেটের নূর জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব সানাউল্লাহকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখনো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন বাবু সুশীল মালাকার। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে জনাব শামসুল আলম ১৯৭০ সালে বায়তুল মোকাররমে পার্টনারে জুয়েলারি ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৭২ সালে আমিও চাকরির পাশাপাশি জুয়েলারি ব্যবসা শুরু করি। ওই বছরই বাবু সুশীল মালাকার আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। তখনো ঢাকা জুয়েলার্স সমিতি নাম ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে জনাব সানাউল্লাহ ইস্টার্ন জুয়েলার্সের মালিক জনাব রশিদকে সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। আমরা কাজ শুরু করলাম। এর মধ্যেই জনাব শামসুল আলম আমাকে খবর দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয়েছিল শংকর বোর্ডিংয়ে। আমি দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি আমার দেশের ছেলে। যেহেতু জুয়েলারির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, চল আমরা ঢাকা জুয়েলার্স সমিতি তুলে দিয়ে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি করি।' আমি আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, 'এটা ভালো প্রস্তাব। বাংলাদেশব্যাপী হওয়া উচিত।' বিষয়টি সভাপতি জনাব রশিদের সঙ্গে আলাপ করলাম। বাবু সুশীল মালাকার তার আগেই দেশ ত্যাগ করে কলকাতা চলে গেছেন। আমি রাজি হলাম। 'বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি'র আত্মপ্রকাশ হলো ১৯৭২ সালে। নন রেজিস্টার্ড। সারা বাংলাদেশ ট্যুর দিলাম। তার আগে আমি জনাব শামসুল আলমকে বললাম, 'বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির একটি ছোটখাটো কমিটি ঢাকা থেকে ঘোষণা দিন। কমিটি করে তারপর আমাদের সারা দেশে ঘোরা শুরু করা উচিত।' তখন তিনি তাঁতীবাজারের ৭৬ নম্বর বাড়িতে (যা বর্তমানে ঊর্মি ভিলা) থাকতেন। ওই বাড়িতে বসেই জনাব রশিদের উপস্থিতিতে একটি কমিটি গঠন করা হলো। তখন আমি বললাম, 'আমি তো ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক আছি। যদি আপনারা ঢাকা মহানগর কমিটি রাখেন তাহলে আমি এ পদে থাকব। আর যদি না রাখেন তাহলে বিলুপ্ত করে জনাব রশিদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও জনাব শামসুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করুন।' ১৯৭২ সালে ঢাকা জুয়েলার্স সমিতি বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি গঠন করা হলো। ওই কমিটির ১ নম্বর যুগ্মসম্পাদক করা হলো আমাকে। তবে জনাব রশিদ কিন্তু ভারপ্রাপ্ত সভাপতিই ছিলেন। কারণ সভাপতি জনাব সানাউল্লাহ অসুস্থ হওয়ায় তিনি ঠিকমতো কাজ করতে পারছিলেন না। এভাবেই চলছিল।

আমরা মাঝে মাঝে দুই বছর, তিন বছরের জন্য সিলেকশন কমিটি করতাম। কিন্তু হঠাৎ করে ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি বা শেষ দিকে জুয়েলারি ব্যবসার ওপর আবগারি কর আরোপ করল সরকার। আমরা কর প্রত্যাহারের দাবি জানালাম। কোনোভাবেই সরকার রাজি হলো না। তখন আমরা সরকারকে ধর্মঘটে যাওয়ার আলটিমেটাম দিলাম। আমরা জানাতে পেরেছিলাম, যে জিনিসের ক্ষয় হয়ে যায় তার ওপর আবগারি কর আরোপ করা হয়। কিন্তু সোনা তো ক্ষয় হয় না। সোনার ওপর কেন আবগারি কর? এ নিয়ে আন্দোলনের দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে ১১ জনের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো। কমিটিতে আমি, জনাব শামসুল আলম হাসু, জনাব শামসুল আলম, বাবু গঙ্গাচরণ মালাকার, জনাব কাজী সিরাজুল ইসলাম, জনাব এম এ হান্নান আজাদ, জনাব হাবিবুর রহমান কাওসারসহ অনেকেই ছিলেন।

তখনো জনাব রশিদ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, জনাব শামসুল আলম সাধারণ সম্পাদক। এ সময় আমাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। তখন জনাব শামসুল আলম হাসু, জনাব আফাজউদ্দিন খান এবং তাঁতীবাজারের পোদ্দার সমিতির সভাপতি জনাব হাজি মকবুল আহমেদ মিলে ভিন্ন অবস্থান নেন। আন্দোলন জোরদার করার জন্য আমরা জনাব শামসুল আলম হাসুকে ম্যানেজ করি এবং জনাব রশিদকে সরিয়ে জনাব শামসুল আলম হাসুকে সভাপতি করা হয়। তখনো আমি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। জনাব কাজী সিরাজুল ইসলাম, জনাব আলী আকবর খানসহ স্বনামধন্য জুয়েলারি মালিকরা আমাদের সমর্থন দেন। তখন পোদ্দার সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান আজাদ, সভাপতি জনাব হাবিবুর রহমান কাওসারও সমর্থন দেন।

সবার সমর্থন নিয়ে আমরা ধর্মঘট শুরু করলাম। দীর্ঘ নয় মাস সারা দেশের জুয়েলারি দোকান বন্ধ ছিল। আন্দোলন সংগ্রাম করার কারণে তখন আমাদের নামে মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছিল। আবগারি করের বদলে সরকার 'ক্যাপাসিটি ট্যাক্স' ধার্য করার ঘোষণা দিলে ১৯৭৯ সালে আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিই। যার যতটুকু সোনা মজুদ আছে তার ওপর ঘোষণা দিয়ে ট্যাক্স দিতে বলা হলো। দেখা গেল দীর্ঘ ধর্মঘটের কারণে অনেক স্বর্ণশিল্পী না খেয়ে মারা গেছেন। আমাদের আর কোনো উপায়ও ছিল না। যার ফলে আমরা সরকারের নির্দেশনায় ক্যাপাসিটি ট্যাক্স দেওয়ার শর্তই মেনে নিই।

১৯৭২ সালে আমি আর জনাব শামসুল আলম সারা দেশ ঘুরে কমিটি গঠন করেছি। যেখানে যে কজন পাওয়া গেছে তাদের দিয়েই কমিটি গঠন করে দিয়েছি। ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর আমি, জনাব কাজী সিরাজুল ইসলাম, জনাব শামসুল আলম হাসু, জনাব শামসুল আলম সারা বাংলাদেশ ঘুরেছি। তখন জনাব শামসুল আলম হাসু অনেক পরিশ্রম করেছেন। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির রেজিস্ট্রেশন নিয়ে বাজুসের সভাপতি জনাব শামসুল আলম হাসুর সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলমের কিছুটা মতপার্থক্যও হয়েছিল। জনাব শামসুল আলম হাসু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সঙ্গে আমিও ছিলাম। ১৯৮৪ সালে আমরা সমিতির সরকারি রেজিস্ট্রেশন পাই। এজন্য আমাদের অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে। সত্যিকার অর্থে ১৯৮৪ সালে সরকারের স্বীকৃতি পাওয়ার পরই বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল। তার আগে আমরা আন-রেজিস্টার্ড সমিতি হিসেবে ছিলাম। তখনো জনাব শামসুল আলম হাসু সভাপতি ও জনাব শামসুল আলম সাধারণ সম্পাদক। আমি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। জনাব কাজী সিরাজুল ইসলাম ও জনাব আলী আকবর খানসহ অনেকেই ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিভিন্ন মার্কেটের প্রতিনিধি ও অন্য দোকানদারদের সহায়তা নিয়ে আমরা যাত্রা করি।

এভাবেই চলছিল। তবে মাঝখানে কোনো এক সময় নির্বাচন হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জনাব শামসুল আলম হাসু ও জনাব শামসুল আলম প্যানেল দিয়েছিলেন। সেই নির্বাচনে জনাব শামসুল আলমের প্যানেল পাস করেছিল। আমি নির্বাচন করেছিলাম হাসু সাহেবের প্যানেলে। সেই প্যানেল থেকে আমি সদস্যপদে পাস করেছিলাম। জনাব শামসুল আলমের প্যানেলে সভাপতি প্রার্থী ছিলেন জনাব এম এ ওয়াদুদ খান। জনাব শামসুল আলমের প্যানেল বিজয়ী হয়। সদস্যপদে বিজয়ী হলেও আমাকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই বছরই ব্যালটের মাধ্যমে বাজুসের প্রথম ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে সবাই মিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হতো।

নির্বাচনের কিছুদিন পরই আমরা আবার একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ শুরু করি। আমাদের গঠনতন্ত্রের মধ্যে সব লেখা আছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে আমিও একজন। এভাবেই ধীরে ধীরে আমাদের যাত্রা হলো। পরবর্তীতে বায়তুল মোকাররম মার্কেটে আমাদের অফিস নেওয়া হয়। তার আগ পর্যন্ত আমরা জনাব শামসুল আলমের তাঁতীবাজারের বাসায় একটি রুমে কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর জনাব শামসুল আলম হাসু ভোট কারচুপির অভিযোগে মামলা করলে এ কমিটি দায়িত্ব পালন করে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। ২০০৬ সালে নির্বাচন হয়েছিল। সেই নির্বাচনে জনাব এম এ ওয়াদুদ খান সভাপতি ও জনাব দিলদার আহমেদ সেলিম সাধারণ সম্পাদক হন।

স্বর্ণ কাহিনি

এম এ ওয়াদুদ খান
সাবেক সভাপতি, বাজুস

স্বর্ণ একটি মূল্যবান ধাতু। এ ধাতুটি সব যুগে সর্বত্র ব্যাপক পরিচিত এবং বহুমাত্রিকতার কারণে সর্বজনবিদিত। ল্যাটিন শব্দ Aurum থেকে এর উৎপত্তি; যার বৈজ্ঞানিক সাংকেতিক নাম Au। ধাতব পদার্থ আবিষ্কার ও ব্যবহারের পর থেকেই স্বর্ণের পরিচিতি এবং প্রয়োজনীয়তা সব দেশে ভীষণভাবে জানান দিয়েছে। এর প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা বা শাব্দিক উচ্চারণ বহু বছর ধরেই আমরা অবগত। এমনকি বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য বলতে ঢাকার 'মসলিন' এবং মণিকারদের তৈরি স্বর্ণালংকার বোঝাত। মসলিনের ঐতিহ্য কিছুটা হারিয়ে গেলেও স্বর্ণ ও স্বর্ণের তৈরি অলংকার এখনো স্বমহিমায় প্রতিভাত, আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে আছে।

স্বর্ণের প্রয়োজনীয়তা : স্বর্ণ এবং স্বর্ণালংকারের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ। স্রষ্টার সৃষ্টির অর্ধেক নারী এবং নারীর মোহনীয়তা, রূপলাবণ্য সবকিছু বেড়ে যায় স্বর্ণালংকারে। আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে যে কোনো অনুষ্ঠান, বিয়ে, আশীর্বাদ বা মঙ্গল কামনায় এ উপমহাদেশের সোনার প্রচলন অনাদিকাল থেকে আজও বিদ্যমান। পূতপবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় স্বর্ণকে। কবিতার ভাষায়– সোনার হাতে সোনার কাঁকন কিসের ইঙ্গিত বহন করে। বিশ্বকবি রবিঠাকুরের অনবদ্য গ্রন্থ সোনার তরী, সোনার বাংলা গান-কবিতা ছাড়াও অনেক কবি-সাহিত্যিকের অমূল্য গ্রন্থে সোনার জয়গান শোনা যায়। লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। বাংলা সাহিত্যে যত কিছু ইতিবাচক এবং সমৃদ্ধ শব্দ রয়েছে তার শুরুতে সোনা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। ধরা যাক, সোনার বাংলা, সোনালি ফসল, সোনার ছেলে, সোনাবউ, সোনার হরিণ, সোনালি আঁশ ইত্যাদি শব্দ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

সোনা শুধু সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেনি বরং এর ব্যবহার বহুমাত্রিকতা পেয়েছে। উন্নত বিশ্বেও এর কদর যথেষ্ট। ইদানীং অতিমূল্যবান ইলেকট্রনিক সামগ্রীতেও সোনার ব্যবহার দেখা যায়। বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় ওষুধেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সোনার রিজার্ভ দেখে বোঝা যায় সে দেশের অর্থনীতির হালচাল। ধরা যাক আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ও উন্নত বিশ্বের দুয়েকটি রাষ্ট্রের সোনার রিজার্ভ। বর্তমানে ভারতের সোনার রিজার্ভের পরিমাণ ৭৯৫ টন, পাকিস্তানে ৬৪ দশমিক ৬৫ টন, শ্রীলঙ্কায় ০ দশমিক ৪৭ টন, বাংলাদেশে ১৪ দশমিক ৩ টন, চীনে ২ হাজার ৬৮ টন, আমেরিকায় ৮ হাজার ১৩৩ টন।

আদিযুগ থেকেই সোনার প্রতি মোহ ও চাহিদা মানুষের স্বভাবজাত। যুদ্ধবিগ্রহ, প্রেম-ভালোবাসার পেছনেও সোনার অবদান অনস্বীকার্য। ডুবন্ত টাইটানিকের গুপ্তধন ও স্বর্ণের খোঁজে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর তলদেশে মানুষের প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে 'টাইটান' নামক সাবমেরিনে অভিযাত্রীরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান। অকালে নিহত হয়েছেন পাঁচ অভিযাত্রী। পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত অ্যামাজনের গহিন অরণ্যে সোনা, রুপা ও ধনরত্নের খোঁজে অভিযাত্রীরা আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। কথিত আছে, মঙ্গল গ্রহে লুকিয়ে আছে সোনায় মোড়ানো 'এল-ডোরাডো' নামের গুপ্ত শহর। সেখানে লুক্কায়িত আছে সোনার অফুরন্ত ভান্ডার। অনেক তীর্থস্থানে রয়েছে

সোনার দেবদেবী, পাঞ্জাবের অমৃতসরে আছে শিখদের সোনার মন্দির। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃন্দাবনে গোবিন্দ মন্দিরে আছে ৫০ ফিট উঁচু স্বর্ণের তালগাছ। এমনকি মুসলমানদের আছে সোনার মদিনায় মসজিদে নববীতে সোনায় মোড়ানো অনেক কারুকাজ।

আদিকাল থেকেই এ উপমহাদেশ সোনা-রুপা বিভিন্ন ধনভান্ডারে সমৃদ্ধ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবীয় বণিকরা এখানে ব্যবসা করতে আসতেন। পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাংয়ের ভ্রমণ কাহিনি থেকে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ জানা যায়। গ্রিক, শক, হুন ও বর্গীয়রা বারবার নিষ্ঠুর আক্রমণ করে এ দেশের স্বর্ণসম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। গজনির সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও মণিমুক্তার ভান্ডার। এভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পর্তুগিজ ও ফরাসি ব্যবসায়ীরা পাল্লা দিয়ে লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতে শুরু করেন এখানকার ধনসম্পদ। পরবর্তীতে লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দখল করে নেয় এ দেশের সম্পদ। ১৯০ বছর রাজত্ব করে হীরা, মুক্তা ও স্বর্ণভান্ডার লুট করে নিয়ে যায় এবং সৃষ্টি করে যায় সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণিভেদ ও বর্ণবৈষম্য। ১৯৪৭ সালে আমরা ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করলেও বাঙালি নতুন করে পাকিস্তানিদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। যার ফলে আমাদের মণিকারদের সুনাম-সুখ্যাতি বিশ্বজুড়ে থাকলেও প্রযুক্তিগতভাবে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ি এবং ভারত এ শিল্পে অনেক এগিয়ে যায়।

স্বর্ণকে বলা হয় সেফ হ্যাভেন। স্বর্ণালংকার ও স্বর্ণপিণ্ড কিনে গচ্ছিত রাখা এ উপমহাদেশের মানুষের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণে যখন কাগুজে মুদ্রার চাহিদা কমে যায় অর্থাৎ মানুষ মুদ্রা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তখনই ধাতব পদার্থ বিশেষ করে স্বর্ণের চাহিদা কয়েক গুণ বাড়তে থাকে।

এখন আসা যাক বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে। তৎসময়ে এ ব্যবসায় যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা অনেকেই বংশপরম্পরায় এ ব্যবসার হাল ধরেন। মোটামুটি সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ভারত থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায় ওই সময় এ ব্যবসায় জড়িত ছিল।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে এরকম সংঘবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠানের কথা তাঁরা চিন্তা করেননি। ঢাকার মণিকারদের সুনাম-সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে সর্বজনবিদিত ছিল। তাঁতীবাজার ও ইসলামপুরের একটি অংশ নিয়েই জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল। পরবর্তীতে নিউমার্কেটে দু-চারটি এবং তারপর বায়তুল মোকাররমে এ ব্যবসাটি প্রসারিত হয়। তৎকালীন পুলিশি হয়রানি প্রতিরোধকল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাজুস। এর সংগঠনের সাহসী সৈনিক ছিলেন প্রয়াত শামসুল আলম (নানাভাই)। যতটুকু জানা যায়, সনটি ছিল ১৯৬৬।

পুরনো জুয়েলার্সদের মধ্যে ইসলামপুরের মণিকাঞ্চন জুয়েলার্স, মাতৃকাঞ্চন, ঢাকা গিনি প্যালেস, ইষ্টার্ণ জুয়েলার্স, মুসলিম জুয়েলার্স, চান জুয়েলার্স, সোসাইটি জুয়েলার্স, লাভলী জুয়েলার্স, সাহা জুয়েলার্স, সেনকো জুয়েলার্স, কনক জুয়েলার্স, মডার্ন গিনি হাউস, পোদ্দার গঙ্গুবাসী, ঢাকা গিনি ম্যানসন, ইব্রাহিম (শেখ) জুয়েলার্স, মিনার্স জুয়েলার্স, নবাবপুরে ছিল কাশেম জুয়েলার্স, নাজ জুয়েলার্স, গিনি এক্সচেঞ্জ পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে স্থানান্তর হয়। নিউমার্কেটে ছিল ইউনাইটেড জুয়েলার্স, হাশেম জুয়েলার্স, নূর জুয়েলার্স, মেট্রো জুয়েলার্স। পরবর্তীতে বায়তুল মোকাররমের দোতলায় মোনা জুয়েলার্স, আরও পরে নিচতলায় আমিন জুয়েলার্সসহ বেশ কিছু দোকান স্থাপিত হয়।

তৎসময়ে ভারত থেকে আগত বেশকিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জেলা শহরেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মোটামুটি বংশপরম্পরায় ব্যবসা ছিল এবং এ শিল্পের শিল্পী বলতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই ছিলেন। শিল্পীদের কারখানা অধিকাংশ তাঁতীবাজারে অবস্থিত ছিল। এখনও সিংহভাগ কারখানা ওই তাঁতীবাজারেই অবস্থিত।

এখন আসা যাক আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে। জুয়েলারি বা স্বর্ণ সম্পর্কে আদৌ কোনো জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। পুরান ঢাকার একটি বাসায় পাশাপাশি অবস্থানের কারণে পরিচয় হয় জনাব হান্নান আজাদের সঙ্গে এবং খুবই ঘনিষ্ঠতার কারণে তাঁরই

সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আমার জুয়েলারি ব্যবসায় প্রবেশ। তিনি তখন তাঁতীবাজারের একটি ছোট ঘরে বুলিয়ন ব্যবসা করতেন। যাকে আমরা পোদ্দার বলে জানি। ১৯৭৮ সালে চাঁদনী চক মার্কেট প্রতিষ্ঠা লাভের পর সেখানে একটা দোকান কিনে 'চন্দ্রিমা জুয়েলার্স' নামে জুয়েলারি ব্যবসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সেলস ট্যাক্স ধার্য করার প্রতিবাদে সমগ্র বাংলার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে আবগারি শুল্ক আরোপিত হয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়। চন্দ্রিমা জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যবসা ভালো ছিল। ঢাকাসহ সর্বত্র এর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়াতে থাকে।

জুয়েলার্স সমিতির কার্যালয় ছিল ইসলামপুরে হোমিওপ্যাথি দোকানের ওপরে দ্বিতীয় তলায়। প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন নূর জুয়েলার্সের মালিক (মরহুম) সানাউল্যাহ সাহেব ও সাধারণ সম্পাদক (মরহুম) শামসুল আলম (নানাভাই)। আমার সঙ্গে নানাভাইয়ের খুব একটা ভালো পরিচয় ছিল না এবং সমিতির কমিটি বা রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে চাইতাম না। কিন্তু ছাত্রজীবনে রাজনীতি এবং খেলাধুলায় বেশ এগিয়ে ছিলাম।

একদিন হঠাৎ দেখি আল-হাসান জুয়েলার্সের মালিক খবির ভাই ও শামসুল আলম (নানাভাই) দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দোকানে ঢোকার কোনো অবস্থা ছিল না। খবির ভাই কোনোরকমে ঢুকেই আমার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিয়ে বাইরে আসার অনুরোধ করেন। বাইরে বের হতেই নানাভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং এ টাকাটা বায়তুল মোকাররমে অফিস কেনার জন্য চাঁদা হিসেবে নিলেন। যতদূর শুনেছি খবির ভাই, তারা ভাই, লাইছ ভাই এদের কাছে থেকে চাঁদা নিয়েছেন এবং সেদিনই নানাভাই বললেন, 'আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকদের সমিতিতে আসা প্রয়োজন ও আসা উচিত।' আমি তখনো সম্মতি প্রকাশ করিনি। এর আট-দশ দিন পর আমাকে সহসভাপতি মনোনীত করে বাজুসের প্যাডে একখানা চিঠি দেওয়া হলো। তখন সভাপতি ছিলেন শামসুল আলম হাসু। ১৯৮৪ সাল থেকেই আমি সহসভাপতি, সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে ছিলাম। কিন্তু গিনি সোনার মূল্য নির্ধারণ করা ছাড়া কোনো কাজ ছিল না বা করার আগ্রহ ছিল না।

কেউ কোথাও পুলিশি হয়রানি বা কোনো দোকানে চুরি-ডাকাতি হলে দেশব্যাপী এর প্রতিবাদ হতো। তৎকালীন সভাপতি হাসু ভাই নির্বাচন বোর্ড গঠন করে নির্বাচন ঘোষণা করেন। নানাভাইয়ের পরিবার এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে চাপ দিয়ে সভাপতি নির্বাচনের জন্য রাজি করান। বাজুসের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম নির্বাচন। নির্বাচনের একই বছরের মধ্যেই বাজুসের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নানাভাই ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে ইসি সভায় জনাব হান্নান আজাদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

মামলা বেড়াজাল থেকে বাজুসকে রক্ষার নিমিত্তে জনাব আনোয়ার হোসেনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করায় এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় এফবিসিসিআইয়ের তত্ত্বাবধানে ২০০৬ সালে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সক্ষম হই। এবং সেই নির্বাচনে আমাকে সভাপতি ও আপন জুয়েলার্সের জনাব দিলদার আহমেদ সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এ নির্বাচনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল। ১৯৯৬ সালে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই স্বর্ণের মানোন্নয়ন ও স্বর্ণনীতি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। প্রতিটি ইসি কমিটির সভায় এ ধরনের এজেন্ডা থাকত। কিন্তু কেন যেন আমরা বারবার হোঁচট খেয়েছি। পরবর্তীতে সেলিম সাহেব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পরপরই স্বর্ণের মানোন্নয়নের জন্য একতরফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা স্বর্ণের মান উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি যা প্রতিবেশী দেশসহ বহির্বিশ্বেও প্রশংসিত হয়েছে। Carat Compromise বা প্রতারণা করে এ সুন্দর ব্যবসার সুনাম নষ্ট করা একান্তই গর্হিত কাজ।

২০১১ সালে স্বর্ণনীতি প্রণয়নে অক্ষমতার কারণে আমি সভাপতি পদে আর থাকব না বলে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের ঘোষণা দিই। এর পরে যাঁরা এসেছেন কেউই আর এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেননি। পরিশেষে গঙ্গা দা সভাপতি এবং জনাব দিলীপ কুমার আগরওয়ালা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর স্বর্ণনীতির গতি সঞ্চার হয় এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বর্ণনীতি আলোর মুখ দেখে এবং দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন স্বর্ণনীতি আমরা পাই। যদিও এখানে এখনো অনেক কাজ করার সুযোগ আছে।

২০১৯ সালের নির্বাচনটি ছিল বেশ ত্রুটিপূর্ণ এবং একপেশে। যার ফলে ২০২১ সালে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে বসুন্ধরা গ্রুপের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সায়েম সোবহান আনভীর সাহেবকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে রাজি করাই। তাঁর কৃপায় বসুন্ধরার লেভেল ১৯-এ বাজুসের একটি মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন অফিস স্থাপিত হয়েছে। অচিরেই আমাদের দেশে বেসরকারিভাবে স্থাপিত গোল্ড রিফাইনারি থেকে 'মেড ইন বাংলাদেশ' সংবলিত সোনার বার সমগ্র বাংলাদেশে সরবরাহ করা হবে। জুয়েলার্সদের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত আশা বাস্তবায়ন হবে।

বর্তমান সভাপতি জনাব সায়েম সোবহান আনভীর একজন উদ্যমী, সজ্জন, আশাবাদী মানুষ। তিনি মানুষকে শুধু আশার আলোই দেখান না, সঙ্গে সঙ্গে আশাগুলোর বাস্তবায়নের রূপরেখাও দেন। সমগ্র বাংলার জুয়েলার্সরা গর্বের সঙ্গে, বুকভরা আশা নিয়ে তাঁর দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে আছেন। ফলে সমগ্র বাংলাদেশের জুয়েলার্সদের সদস্যসংখ্যা বেড়ে ৪০ হাজারের কাছাকাছি। সবাই সদস্যপদ লাভের জন্য উন্মুখ। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন এবং উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে কয়েকটি দাবি রেখে আমার লেখার সমাপ্তি টানতে চাই–

ক. স্বর্ণনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই।

খ. ভ্যাট-ট্যাক্স সহনীয় পর্যায়ে এনে সবাইকে ভ্যাটের আওতায় আনার জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

গ. স্বর্ণের মান কোনোরকম নেতিবাচক বা উচ্চাভিলাষীদের সঙ্গে আপস করা যাবে না। প্রয়োজনে বিএসটিআইতে একটি আধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং সর্বদা মনিট রিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যমান ল্যাবগুলোর মান আরও বাড়াতে হবে।

ঘ. বৈধ জুয়েলার্সদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. অচিরেই একটি গোল্ড ব্যাংক স্থাপনসহ ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ. অযথা পুলিশি হয়রানি বন্ধ এবং বৈধ জুয়েলার্সদের সোনা বা সোনার অলংকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলাচলে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করা।

ছ. স্বর্ণ চোরাচালান রোধে আইনের কঠোর অনুশাসন প্রয়োগ করা জরুরি।

জ. এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক জব্দ স্বর্ণের হিসাব প্রদানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত বা মজুদ স্বর্ণ প্রকাশ্যে নিলামের ব্যবস্থা করা।

ঝ. বৈধ কাগজপত্র যথা জাতীয় পরিচয়পত্র, ক্যাশমেমো, মোবাইল নম্বরসহ ক্রয় রসিদের মাধ্যমে কেনা সোনার ব্যাপারে পুলিশি হয়রানি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

ঞ. এ শিল্পকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিল্প ঘোষণা করা হোক।

ট. শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ডিজাইনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন রত্নের পরীক্ষার জন্য Gemological Institute প্রতিষ্ঠা করে বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করা।

ঠ. বাজুস নির্ধারিত স্বর্ণের মূল্য বাংলাদেশের সর্বত্র অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। অনেক মার্কেট বিশেষত মফস্বল শহরে নির্ধারিত মূল্যের কমে অলংকার বিক্রি হচ্ছে বলে অনেকের কাছে শোনা যায়। এমনকি ভ্যাট-মজুরি কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে নজরদারি বাড়াতে হবে।

যাই হোক, আমি আমার স্বল্পপরিসরে লেখা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্বে ছিলাম। অনেকেরই সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি; কারও সঙ্গে কোনো বৈরিতা সৃষ্টি হয়নি। তাই জীবনসায়াহ্নে সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা এবং সবার দোয়া কামনায় শেষ করছি।

কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত জুয়েলারি শিল্প

ডা. দিলীপ কুমার রায়
সাবেক সভাপতি, বাজুস

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্যিক সংগঠন। ১৯৬৬ সালে দেশের জুয়েলারি শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির যাত্রা হয়। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জুয়েলারি শিল্পটি বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জুয়েলারি শিল্প ওতপ্রোত জড়িত। বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের অতীত ইতিহাস অনেক সাফল্যমণ্ডিত। এখানে লাখ লাখ শ্রমিক যাঁদের আমরা স্বর্ণশিল্পী হিসেবে জানি তাঁদের হাতের নিপুণ কারুকার্যে তৈরি গহনা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এখানকার শিল্পীরা যাঁদের আমরা তাঁতীবাজারে দেখি, এই তাঁতীবাজার একসময় দুবাইয়ের গোল্ড সুকের মতো রমরমা ছিল। কালের বিবর্তনে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য চিন্তা করেছিলেন। এ দেশের জুয়েলারি শিল্প যাতে বিশ্বের সব দেশে সমাদৃত হয় ও স্বর্ণশিল্পীরা যাতে যথাযথ সম্মান পান সে ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জুয়েলারি শিল্প অনেকটাই হারিয়ে যায়। এই সম্ভাবনাময় একটি শিল্পের কোনো ধরনের নীতিমালা না থাকার কারণে আমরা এ শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারিনি। কারণ এ শিল্পে যাঁরা ব্যবসা করতেন তাঁদের কোনো বৈধতা ছিল না, গহনা তৈরির জন্য কাঁচামালের উৎস ছিল না। বিদেশে রপ্তানি করা দূরে থাক, দেশের অভ্যন্তরে সোনার গহনা তৈরির ক্ষেত্রে কোথা থেকে সোনা পাওয়া যাবে তা নিয়েই ব্যবসায়ীদের মধ্যে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। যার কারণে এ শিল্পে এখন পর্যন্ত বড় বিনিয়োগ হয়নি এবং বড় শিল্পপতিরা এ শিল্পে দৃষ্টিপাত করেননি।

আমি ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো বাজুসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বিগত আমলের সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে দেখি এ শিল্পে সবার আগে একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। তাই সভাপতি হওয়ার পরপরই স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের কাজে হাত দিই। এ নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তমন্ত্রণালয় তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে ধরনা দেওয়া শুরু করি এবং কাজ অনেকটাই এগিয়ে নিতে সক্ষম হই। এ শিল্পে ২০০৭ সালের আগে ক্যাডমিয়াম পদ্ধতি ছিল না। অর্থাৎ সোনার গহনায় খাদ ও সোনার পরিমাণ কাগজে থাকত, বাস্তবে থাকত না। এরপর সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা ক্যাডমিয়াম পদ্ধতি চালু করতে সক্ষম হই। অর্থাৎ আজকের প্রেক্ষাপটে বলতে হয় যে, বাংলাদেশের সোনার মান আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষ হয়েছে।

এ স্বর্ণ নীতিমালাটি দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ শিল্প উন্নয়নে এবং বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এ নীতিমালা প্রণয়নের কারণে অবশেষে জুয়েলারি শিল্পের হারানো ঐতিহ্য আবারও ফিরে আসার পাশাপাশি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এরই মধ্যে বর্তমান বাজুসের প্রেসিডেন্ট এ উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সায়েম সোবহান আনভীর সাহেবকে বাংলাদেশের সব জুয়েলারি মালিক অনুরোধ করেন এ সংগঠনের হাল ধরার জন্য। তিনি সবার অনুরোধক্রমে তাঁর অন্যান্য শিল্পের মতোই এই জুয়েলারি শিল্পকে ভালোবেসে এ সংগঠনের নেতৃত্ব

দেওয়ার জন্য সম্মতি প্রদান করেন এবং আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করি। তিনি নেতৃত্বে আসার পরপরই এ শিল্পে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

আমাদের সাংগঠনিক কমিটির কার্যক্রম শহর ছাড়িয়ে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। এমনকি গ্রাম পর্যায়ের ছোট ছোট জুয়েলারি দোকানদাররাও আজ বাজুসের সদস্যপদ গ্রহণ করছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানকে আমরা এ এসোসিয়েশনের আওতায় আনতে পেরেছি। প্রতিটি জেলা, উপজেলায় আমরা মিটিং ও মতবিনিময় সভা করেছি। অর্থাৎ একটি প্রাণবন্ত সংগঠন হিসেবে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করেছি।

আমি মনে করি বাণিজ্য সংগঠন তথা এফবিসিসিআই অধিভুক্ত যতগুলো এসোসিয়েশন আছে, তার মধ্যে বাজুস পরিবার সবচেয়ে বড় ও সুশৃঙ্খল সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৬৬ সালে প্রথম যাত্রাকালে আমরা যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেছিলাম তার বেশির ভাগই এই ৫৮তম বছর শেষে পূরণ করার যথাযথ চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি যাঁদের শ্রমে বাজুস আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে সেসব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে; যাঁরা আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁদের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে আজ বলতে চাই– বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য যা আপনারা রেখে গিয়েছিলেন সেই ঐতিহ্য আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের মাধ্যমে আবারও ফিরে এসেছে।

আগামী দিনে আমাদের নতুন নতুন পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বাজুসের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন এই জুয়েলারি শিল্প আর পরনির্ভর থাকবে না। আগে আমরা বিদেশ থেকে সোনার অলংকার এনে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতাম। আর এখন আমরা আমাদের দেশে উৎপাদিত সোনা দিয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করব। এবং এ কাজটা আমরা কীভাবে সম্ভবপর করব সেই নির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন। ইতোমধ্যে বসুন্ধরা গ্রুপ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বেসরকারিভাবে বাংলাদেশে 'বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেড' নামে সোনা পরিশোধনাগার স্থাপন করেছে; যার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে বসেই 'মেড ইন বাংলাদেশ' সংবলিত স্বর্ণপিণ্ড বা বার পাব; যেটা এতদিন আমাদের কাছে 'মেড ইন সুইজারল্যান্ড' সংবলিত হয়ে আসত। এটি ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন।

ইতোমধ্যে আমাদের দেশে ছোটবড় বেশকিছু ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়েছে। তাঁতীবাজার আবারও তার নিস্তব্ধতা কাটিয়ে মুখরিত হওয়া শুরু করেছে। অর্থাৎ এখানেই আমাদের সোনার অলংকার প্রস্তুত হবে। বিগত দিনে কাজ না পেয়ে যেসব স্বর্ণশিল্পী বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছিলেন, সেসব হারিয়ে যাওয়া শিল্পীরা আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। আমাদের হাতে তৈরি ঐতিহ্যবাহী সোনার অলংকার প্রস্তুত করবেন।

আমি মনে করি জুয়েলারি শিল্প ভবিষ্যতে পোশাক খাতকেও একদিন ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের হাতে তৈরি ঐতিহ্যবাহী সোনার অলংকার বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের নির্ভরশীল একটি খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি এসোসিয়েশনটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অতএব আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে স্বনির্ভর হয়ে আমাদের জুয়েলারি শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনব।

ব্যাংকার থেকে জুয়েলারি ব্যবসায়

কাজী সিরাজুল ইসলাম
সাবেক সভাপতি, বাজুস

কর্মজীবনের শুরুতে আমি ব্যাংকে চাকরি করতাম। তখন আমার মাইনে ছিল ২৫০ টাকা। জগন্নাথ কলেজে পড়াকালে দেশবরেণ্য অনেক শিক্ষকের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ হয়। পড়ালেখার পাশাপাশি ফুটবল খুব ভালো খেলতাম। ক্লাব পর্যায়েও খেলেছি অনেকদিন। চাকরিতে প্রবেশের কয়েকদিন পরই আমার বাবা মারা যান। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড় হওয়ায় সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। ওই ২৫০ টাকার মাইনেতে পুরো সংসারের খরচ চালাতে হতো।

ব্যাংকে চাকরিরত অবস্থায় নিউমার্কেটের চারজন দোকানদার আমার ব্যাংকে তাদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতেন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়ার সুবাদে তাদের সঙ্গে ভালো একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তখন আমি দুই দোকানের সঙ্গে পার্টনারশিপে কিছু টাকা বিনিয়োগ করি। দু-তিন বছর পর আমার টাকা বিনিয়োগের বিপরীতে বেশ কিছু টাকা লাভ পাই। সেই টাকা দিয়ে বায়তুল মোকাররমের নিচতলায় দোকান কিনি। সালটি খুব সম্ভবত ১৯৬৬ সালের আশপাশে ছিল।

আমি গ্রামের ছেলে হলেও বিয়ে করেছি পুরান ঢাকার শংকরবাড়ির মালিকের মেয়েকে। আমার খালুশ্বশুরের সঙ্গে মোজা সাহেব-নান্নু সাহেবের খুব ভালো পরিচয় ছিল। বিভিন্ন সময় আমার আর্থিক সমস্যায় আমার খালুশ্বশুর নানাভাবে সাহায্য করতেন। দোকান কেনার পর দোকানে মাল প্রদর্শনীর মতো টাকা আমার ছিল না। আমার স্ত্রী, শাশুড়ি, খালাশাশুড়িদের যত ধরনের সোনার গহনা ছিল সেগুলো আমাকে দেন। প্রায় ১০০ ভরির মতো সোনা আমি তাদের থেকে ধার নিই। দোকানের শোকেসে গহনাগুলো সাজিয়ে রাখতাম আর লিখে রাখতাম 'ইহা বিক্রয়যোগ্য না'। কাস্টমার এসে দেখত, ওই ডিজাইন অনুযায়ী অর্ডার রাখতাম। দোকান কেনার অল্প সময়ের মধ্যেই আমার দোকানের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক নীতির সঙ্গে কখনো আপস করিনি। তাই অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হই। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমি যেসব সোনা ধার নিয়েছিলাম তাঁদের সোনা তাঁদের ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হই।

এ প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে আমার কারিগরদের অবদান অনেক। তাঁরাও আমাকে সোনা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁরা বলতেন, 'মহাজন আমাদের কাজ দেন, আমাদের সোনা আপনাকে দেব।' জনাব গঙ্গাচরণ মালাকারও আমার দোকানে কাজ করতেন। কিন্তু তিনি কোনো বেতন নিতেন না। বলতেন, 'আপনার কাছে জমা রাখেন। যখন আমার একটা দোকান দেওয়ার মতো টাকা জমা হবে তখন আমি নেব।' কয়েক বছর পর আমার কাছে যখন তাঁর বেশ কিছু টাকা জমা হয় ওই টাকা আমি তাঁকে দিয়ে দিই এবং তিনি ওই টাকা দিয়ে দোকান কিনে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ও আমি দোকান খুলে রেখেছিলাম। কিন্তু তখন ব্যবসাটা হতো খুব গোপনে। ডিসপ্লেতে কোনো কিছু সাজানো থাকত না। কোনো কাস্টমার এলে ভেতরের রুমে নিয়ে বসাতাম। তারা ওইখান থেকে দেখে অর্ডার করে যেতেন। আমি আবার গোপনে তাদের কাছে ডেলিভারি দিতাম। যখন যেভাবে পেরেছি সবাইকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। ঢাকা শহরের অন্তত ৪০ জন দোকানদার আছেন, যাঁরা কি না আমার দোকানে ও কারখানায় কাজ করতেন।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি যা আজকে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস নামে পরিচিত এর সঙ্গে পথচলা ঠিক কবে থেকে তা-ও সঠিক মনে নেই। তবে বাজুসের সঙ্গে পরিচয় আমার মামা শামসুল আলম (নানাভাই)-এর মাধ্যমে। সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁতীবাজারকেন্দ্রিক জুয়েলারি ব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছে। আমি যখন ব্যবসা শুরু করি

তখন এম এ হান্নান আজাদ সাহেব, খোরশেদ সাহেব পোদ্দারি ব্যবসা করতেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে পাকা সোনা নিয়ে কাজ করতাম। তখনও বাংলাদেশের সোনা ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁতীবাজার। বাজুসের আদি অফিস ছিল ইসলামপুরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজুসের পরিধি বড় হলে নতুন অফিস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

তখন বাজুসের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন নূর জুয়েলার্সের মালিক সানাউল্যাহ সাহেব। তিনি মারা যাওয়ার পর শামসুল আলম হাসু সাহেব ও আমার মামা শামসুল আলম বাজুসের হাল ধরেন। তিনিই একদিন এসে আমার কাছে অফিসঘর কেনার জন্য টাকা চাইলেন। মামা ছিলেন খুবই উদ্যমী মানুষ। বাজুসের জন্য তিনি ছিলেন অন্তঃপ্রাণ। কেউ মামার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন আর তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন এরকম কখনো দেখিনি। যাই হোক, বায়তুল মোকাররমে বাজুসের অফিস নেওয়ার আগে মামা আমার কাছে আসেন। বলেন, বাজুসের নতুন কার্যালয় নেওয়া হবে কিছু টাকা দাও। ওই অফিস নেওয়ার সময় বেশির ভাগ টাকাই আমি দিই। তারা সাহেব, খবির সাহেব, এম এ ওয়াদুদ সাহেব, আলী আকবর খানসহ আরও অনেকেই তখন কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

এভাবেই বাজুসের সঙ্গে পথচলা শুরু। আমি সব সময়ই বাজুসের কোনো না কোনো পদে ছিলাম। আমাদের মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল। যখন যেভাবে পেরেছি বাজুসের প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছি এবং অর্থ প্রদান করেছি। আবগারি শুল্ক আরোপের পর যখন বাংলাদেশের সব জুয়েলার্সের দোকান বন্ধ ঘোষণা করা হলো এবং আন্দোলন শুরু হলো, তখন আন্দোলনের সিংহভাগ ব্যয়ভার আমি বহন করেছি। মিটিং-মিছিলে স্বর্ণশিল্পীরা এলে তাদের কথা মন দিয়ে শুনেছি এবং তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। আন্দোলন শেষে সারা বাংলাদেশে বাজুসের নাম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেলায় জেলায় ঘুরেছি। এ সংগঠনটি দাঁড় করানোর জন্যে শামসুল আলম সাহেব অনেক শ্রম দিয়েছেন। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে সাধারণ আলোচনা সভা হবে, তাদের আমার বাসাতেই খাওয়ানো হয়েছে। তখনকার সময় আমাদের মধ্যে এ ধরনের আন্তরিকতা ছিল। আমরা এক অন্যের সুবিধা-অসুবিধা যতটুকু সম্ভব দেখার চেষ্টা করতাম।

বাজুসের সভাপতি থাকা অবস্থায় যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি সংগঠনের জন্য কাজ করার। একটাই আক্ষেপ থেকে যাবে আমাদের দেশের ভ্যাটহার না কমাতে পারার জন্য। এমনকি এখন পর্যন্ত আমরা ব্যর্থ হয়েছি ভ্যাটহার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে। অথচ আমাদের পাশের দেশগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের ভ্যাটহার অনেক কম; যার ফলে আমাদের স্থানীয় জুয়েলারি শিল্প সামনে এগোতে পারছে না। পাশাপাশি আছে আমাদের কাঁচামালের অভাব।

কাঁচামালের অভাব দূরীকরণে বাজুসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি যেভাবে এ জুয়েলারি শিল্প নিয়ে ভেবেছেন তার আগে কেউ এভাবে ভাবেননি। এত বড় পরিসরে বিনিয়োগ করার চিন্তাও কেউ করেননি। তাঁর এ সাহসী পদক্ষেপের জন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই। জুয়েলারি শিল্পকে বাঁচানোর জন্য এভাবেই সবার এগিয়ে আসা উচিত। নতুন নতুন বিনিয়োগ করা উচিত, তা হলেই আমাদের জুয়েলারি শিল্পের সুদিন ফিরে আসবে। বিশ্বদরবারে আবারও গর্বভরে আমাদের সোনার বাংলাদেশের নাম স্বর্ণশিল্পের মাধ্যমে উচ্চারিত হবে।

অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ সময়ের দাবি

গঙ্গা চরণ মালাকার
সাবেক সভাপতি, বাজুস

বাপদাদার পেশা টিকিয়ে রাখতে মানিকগঞ্জে স্বর্ণশিল্পী (কারিগর) হিসেবে পেশাজীবন শুরু করি। ১৯৪৭ সালে মানিকগঞ্জ থেকে কাজ করতে চলে আসি পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে। সেখানে স্বর্ণশিল্পী হিসেবে ঢাকায় কাজ শুরু করি। ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে বায়তুল মোকাররম মার্কেটে প্রথম অমুসলিম হিসেবে আমি ২০ হাজার টাকা দিয়ে একটি দোকান বরাদ্দ পাই। তার আগে শুধু মুসলমানদেরই দোকান বরাদ্দ দেওয়া হতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রথা তুলে দেওয়ার পর আমি প্রথম একটি দোকান বরাদ্দ পেয়েছিলাম।

১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে সামান্য কিছু মূলধন নিয়ে শুরু করি জুয়েলারি ব্যবসা। আমার প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করি 'ভেনাস জুয়েলার্স'। জুয়েলারি দোকানের পাশাপাশি আমি বিভিন্ন দোকানে গহনাও সরবরাহ করতাম। বেচাকেনা ভালো হওয়ায় পরবর্তীতে বায়তুল মোকাররম মার্কেটে আমি আরও একটি দোকান কিনি। পরে পর্যায়ক্রমে ইস্টার্ন প্লাজা, বসুন্ধরা সিটি, যমুনা ফিউচার পার্ক, নাভানা টাওয়ারে দোকান নিয়েছি।

আমি ২০১৬ সালে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমার মেয়াদকালে এ দেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের প্রাণের দাবি স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়িত হয়। এ ছাড়া দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের কাছে রক্ষিত অপ্রদর্শিত সোনা ও সোনার গহনা এবং ডায়মন্ড সরকারকে কর দিয়ে বৈধভাবে প্রদর্শনেরও সুযোগ পায়।

২০07 সালে ক্যাডমিয়াম পদ্ধতি চালু করতে গিয়ে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছি। ক্যাডমিয়াম পদ্ধতি কার্যকর করতে প্রায় এক বছর লেগেছে। ক্যাডমিয়ামের পর চিন্তা করলাম হলমার্ক নিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ হলমার্ক ছাড়া ক্যাডমিয়াম পদ্ধতির সুফল পাওয়া যাবে না। দেশ স্বাধীনের পর অনেকবার ভারতে গিয়েছি। ঘুরে ঘুরে দেখেছি কীভাবে স্বর্ণের মান নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তাই আমরা কয়েকজনে মিলে একটি ল্যাব তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই। এরপর 'বাংলা গোল্ড লিমিটেড' নামে একটি ল্যাব তৈরি করি। তখনকার শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া এ ল্যাব উদ্বোধন করেন। এখন বাংলাদেশের সোনার মান ঠিক আছে। তার পরও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যোগসাজশ করে বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে গহনা বিক্রি করছেন। এ ব্যাপারে কঠোর পক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সদস্য হওয়ার পর থেকেই আমি সমিতির নিবন্ধন করার বিষয়ে সোচ্চার ছিলাম। জনাব শামসুল আলম হাসু, জনাব কাজী সিরাজুল ইসলাম ও (মরহুম) জনাব আলী আকবর খান এবং আমি মিলে সমিতির হাল ধরি। বাজুসের নিবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শামসুল আলম হাসু। বর্তমানে বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে বাজুসের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আমি সব সময় বাজুস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থেকে বাজুসকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করতে চাই।

বদলে গেছে ডিজাইন, কাস্টমারের চাহিদা

গুলজার আহমেদ
সহ-সভাপতি, বাজুস

বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অতীতে সোনা ও রুপার কালারের বাইরে গহনার অন্য কোনো কালার চিন্তা করা যেত না। কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি কাস্টমারের চাহিদা বদলে গেছে। সোনা ও রুপার বিভিন্ন কালারের গহনার চাহিদা বেড়েছে। একই গহনার মধ্যে কপার, সিলভার, অ্যাশসহ বিভিন্ন কালার কাস্টমার বেশি পছন্দ করছে। এর ধারাবাহিকতায় নতুন প্রজন্মের ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মা-চাচিরা যেসব ডিজাইনের গহনা পছন্দ করতেন এ প্রজন্মের মধ্যে সেসবের চাহিদা কম। এদের মধ্যে আধুনিক গহনার চাহিদা বেশি। মডার্ন গহনার মধ্যে একটু কপার থাকবে, একটু হোয়াইট থাকবে। বর্তমানে আরও পরিবর্তন এসেছে। সোনার কাছাকাছি দামের পাথরের গহনার চাহিদাও বেড়েছে। অনেক কাস্টমার পাথরের গহনা কিনছেন। কিন্তু দেখে মনে হবে এসব বিলাসীদের গহনা। আমরা সব সময় কাস্টমারের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গহনার ডিজাইন করার চেষ্টা করি। কারণ কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী গহনা দিতে না পারলে আমরা কাস্টমার ধরে রাখতে পারব না। এ প্রজন্মের কাস্টমাররা অনেক কিছু ভেবেচিন্তে সোনার গহনা কেনেন। যে গহনা কিনছেন সেটার ভবিষ্যৎ আছে কি না তা জেনে বুঝেই কিনছেন।

আরেকটি বিষয় খেয়াল করলে দেখা যাবে। ১০ বছর ধরে সোনার দাম নিম্নমুখী হয়নি। দাম কিন্তু ঊর্ধ্বমুখীই রয়েছে। আগে যারা গহনা কিনেছেন তারা বেনিফিটেড। কম দামে সোনা কিনেছেন। এখন বিনিময় করলে ডাবল অথবা তিন গুণ দাম পাবেন। বছরে দেড় থেকে দুই লাখ টাকার গোল্ড কিনলে পরের বছর ১০ থেকে ২০ শতাংশ লাভ হয়। এ কারণে কাস্টমারও কমেনি। কাস্টমারও জানেন সোনার গহনা এমন একটা জিনিস কোনো কারণেই লোকসান হবে না। কাপড়, ঘরের অন্য কোনো জিনিস কিনে পরে বিক্রি করতে গেলে সেটার জন্য পুরাতন হিসেবে দাম দেওয়া হয়। গাড়ি যত দিন যাবে তত দাম কমবে। এজন্য কাস্টমার সব সময় জুয়েলারি দোকান থেকে লাভে সোনা কেনার চেষ্টা করেন। এক বছর ব্যবহার করার পরও ১০ থেকে ২০ শতাংশ লাভ অটোমেটিক চলে আসে। ১০ বছর আগে যারা সোনার গহনা কিনেছেন, এখন যদি বিক্রি করেন তাহলে ১০ গুণ বেশি দাম পাচ্ছেন। এটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার। অনেকেই সোনার গহনা কিনছেন মুনাফার জন্য। একই সঙ্গে বিপদাপদে সঙ্গে সঙ্গে দেশের যে কোনো জায়গায় বিক্রি করে দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে।

১০ বছর আগে আমাদের জুয়েলারি শিল্পের কোনো নীতিমালা ছিল না। ফলে জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা নানা রকম সমস্যায় পড়তেন। স্বাধীনতার ৪৮ বছরেও এটা করা সম্ভব হয়নি। এতে বিভিন্ন সময় আমাদের নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ২০১৮ সালে নীতিমালা হওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা সোনা আমদানির নিশ্চয়তা পেয়েছেন। বিগত দিনে আমাদের কাছে থাকা সব সোনা ও ডায়মন্ডের গহনা ভরিপ্রতি ১ হাজার টাকা ট্যাক্স দিয়ে ২০১৯ সালের জুনে আমরা বৈধ করার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের ব্যবসায় স্বচ্ছতা এসেছে। পরবর্তীতে আমাদের অনেক ব্যবসায়ী গহনা আমদানিও করেছেন। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বসুন্ধরা গ্রুপের গোল্ড রিফাইনারি হচ্ছে। দেশে গোল্ড পাওয়া গেলে আমাদের বিদেশি সোনার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে না। দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবেন। সরকার ভ্যাট-ট্যাক্স পাবে। আমাদের মর্যাদা আরও বেড়েছে, দেশের জুয়েলারি শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট ও বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সায়েম সোবহান আনভীর। গত ৪৮ বছরেও দেশের মানুষের জুয়েলারি শিল্প নিয়ে কোনো ইতিবাচক ধারণা ছিল না। সায়েম সোবহান আনভীর সাহেব দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বেশ আলোচনার মধ্যে রয়েছে দেশের জুয়েলারি শিল্প। দেশের বাইরেও পরিচিত করে তুলেছেন বাজুস ও জুয়েলারি

শিল্পকে। এজন্য প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ। অনেক বিদেশি ব্যবসায়ী বাংলাদেশে যৌথভাবে জুয়েলারি শিল্পে বিনিয়োগ করার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সরকারের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি খাতের বড় ব্যবসায়ীরাও জানেন দেশে গোল্ড ইন্ডাস্ট্রি হতে যাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার খবর পেয়ে বিশ্বের বিখ্যাত কয়েকটি জুয়েলারি কোম্পানি আমাদের দেশে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। এসব বিনিয়োগ এলে আমাদের কর্মসংস্থান বাড়বে। পাশাপাশি রপ্তানি আয় বাড়ার মাধ্যমে বাড়বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও।

বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে উৎপাদন করতে হবে আধুনিক ডিজাইনের গহনা। আমরা যারা গহনার খুচরা বিক্রেতা আমাদের উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদনে না গেলে আমদানি করে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারব না। কারণ গোল্ড রিফাইনারিতে উৎপাদন শুরু হলে এ দেশে অনেক বিদেশি কোম্পানি এসে গহনা তৈরি করে আমাদের কাছে বিক্রি করে নিজ দেশে অর্থ নিয়ে যাবে। বিশ্বদরবারে আমাদের নিজস্ব কোনো পরিচিতি তৈরি হবে না। যদিও ইতোমধ্যে অনেকেই ইন্ডাস্ট্রি করা শুরু করেছেন। চার-পাঁচটি ইন্ডাস্ট্রি ছোট আকারে উৎপাদন শুরু করেছে। ভবিষ্যতে রপ্তানি শুরু হলে এসব কারখানার পরিধি অনেক বড় করতে হবে।

সায়েম সোবহান আনভীর একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর দেশের জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে আমাদের সর্বক্ষণ নানা রকম দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আসছেন। আশা করছি তাঁর নেতৃত্বে ২০২৫ সালের মধ্যে আমরা জুয়েলারি সেক্টরে একটা বড় পরিবর্তন দেখতে পাব। আমরা চাই প্রেসিডেন্ট সাহেব জুয়েলারি শিল্পে দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জুয়েলারি শিল্পকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে পারব। কারণ প্রেসিডেন্ট সাহেব দেশের জুয়েলারি শিল্প নিয়ে ভাবেন, চিন্তা করেন। প্রেসিডেন্টের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে দেশের জুয়েলারি শিল্প। বাংলাদেশ থেকে গোল্ড রপ্তানি হবে, আমদানি নয়। আগামী দুই বছরের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ থেকে গোল্ড রপ্তানি করব এটাই আমাদের পরিকল্পনা।

সব বাধা ছিন্ন করে ফুটব মোরা ফুটব গো

আনোয়ার হোসেন
সহ-সভাপতি, বাজুস

বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পের মধ্যে অন্যতম জুয়েলারি শিল্প। প্রায় ৪০০ বছর আগে এ দেশে জুয়েলারি শিল্পের বিকাশ ঘটে। আমাদের দেশের কারিগররা হাতের নিপুণ দক্ষতায় সুচারুভাবে গহনা তৈরি করতেন, যার সমাদর বিশ্বব্যাপী ছিল এবং আছে। বিভিন্ন দেশ থেকে যখন সওদাগররা বাংলায় বাণিজ্য করতে আসতেন, তখন তাদের পণ্যের বিনিময়ে আমাদের দেশ থেকে হাতে তৈরি গহনা ও মসলিন কাপড় নিয়ে যেতেন।

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের তথ্যমতে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত হাতে তৈরি গহনা হয় তার ৮০ শতাংশ বানান বাংলাদেশি কারিগররা। আমরা জুয়েলারি শিল্পের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি এ শিল্পকে আধুনিকায়ন করার, যাতে দেশি ক্রেতারা বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের পণ্যগুলো কিনতে পারেন। কিন্তু সরকারি নীতিমালার অভাবে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর নেতৃত্ব গ্রহণের পর বাজুসের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শহরকেন্দ্রিক বাজুস এখন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তার কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে। বাজুসের ছায়াতলে থেকে জুয়েলারি শিল্পকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি এর গুণমান উন্নয়নের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি। ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহার করে বিদেশি গহনা আমাদের স্থানীয় বাজারে অবাধে প্রবেশের ফলে আমাদের স্থানীয় জুয়েলারি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের স্থানীয় কারিগররা বেকার হয়ে যাচ্ছেন। বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে আমরা জুয়েলারি শিল্পকে ঢেলে সাজাচ্ছি। স্থানীয় বাজারে যাতে চোরাচালানের মাধ্যমে সোনা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বেশকিছু প্রস্তাব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপন করেছি।

সরকারি তথ্যমতে, ব্যাগেজ রুলের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রায় ৫৪ টন সোনা প্রবেশ করে। অবৈধভাবে এর পরিমাণ ২০০ টনের কাছাকাছি হবে বলে মনে করি। মুদ্রার অঙ্কে প্রায় ৮০০ কোটি ডলার দেশের বাইরে পাচার হয়েছে শুধু জুয়েলারি খাতের মাধ্যমে। পাশের দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অলংকার কেনার ক্ষেত্রে ভ্যাট বেশি প্রদান করতে হয়; যার কারণে বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে দেশি ক্রেতারা অলংকার কিনে আনেন। ফলে দেশ হারাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা এবং ক্রেতা হারাচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

তাই সরকারের উচিত ভ্যাটহার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশে আনা; যাতে স্থানীয় বাজারে ক্রেতাসমাগমের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হতে পারেন। সরকারের রাজস্ব খাতেও অবদান রাখতে পারবে জুয়েলারি শিল্প।

দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সায়েম সোবহান আনভীর বাংলাদেশে গোল্ড রিফাইনারি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন; যার ফলে বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্প নতুন আলোর দিশা দেখতে পারছে। কিন্তু এ শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সরকারের নীতিনির্ধারকদের কার্যকর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশি বাজারে সোনার দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের ভ্যাট, শুল্ক হার কমানো এখন সময়ের দাবি।

যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের ক্রেতারা স্থানীয় বাজার থেকে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে সোনা কিনতে পারবেন। দেশের অর্থ দেশে রাখার প্রচেষ্টা সফল হওয়ার পাশাপাশি ভোক্তা ও বিক্রেতার স্বার্থরক্ষা হবে এবং সোনা রপ্তানিতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারব।

আমি বাজুসের মেম্বার প্রায় ৩৬ বছর ধরে। এ বাজুস তখন এককেন্দ্রিক তথা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যবসায়ীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো; যাদের কোনো জবাবদিহিতা থাকত না। এ পরিপ্রেক্ষিতে জবাবদিহির অভাবে অনেক ভালো কাজ আমরা করতে পারিনি এবং সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অনেক বিষয়ের সমাধান করতে পারিনি।

আমি এফবিসিসিআইয়ের তিনবারের নির্বাচিত পরিচালক ছিলাম। সে সময় স্বর্ণ রপ্তানি নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আমি প্রায় ২৭ বছর ধরে স্বর্ণ রপ্তানিসংশ্লিষ্ট দেনদরবারে সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৯৩ সালে আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের জয়েন্ট ভেনচার বা যৌথ মূলধনি কারবারের মাধ্যমে একটি জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলি। সেই ফ্যাক্টরিতে বিশ্ববিখ্যাত একটি ব্র্যান্ডের হাতে তৈরি রোপ চেন/দড়ি চেন তৈরি হতো; যার সম্পূর্ণটুকু আমেরিকায় রপ্তানি হতো। সেখানে প্রায় বাংলাদেশের ৩০০ শিক্ষিত মহিলা শ্রমিক/কারিগর কাজ করতেন। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সময়োপযোগী এবং দেশোপযোগী নীতি বা পলিসি পাইনি।

বর্তমানে বাজুসের নেতৃত্বের পরিবর্তন বিশেষ করে আমাদের প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বাজুসের কর্মক্ষমতা এবং গতি সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছে। এ অবস্থায় আমাকেসহ আরও অনেক নেতাকে বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য এর কর্মক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। আশা করি প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জুয়েলারি শিল্পের নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। আমি বর্তমানে বাজুসের সহসভাপতির দায়িত্বে আছি এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সারা দেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা একযোগে কাজ করছি।

স্বপ্ন দেখি দিন বদলের

এম এ হান্নান আজাদ
সহ-সভাপতি, বাজুস

আমি ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম জুয়েলারি ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। ১৯৭৬ সালে তাঁতীবাজার পোদ্দার সমিতির সেক্রেটারি নির্বাচিত হই এবং ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করি। সর্বশেষ আমি সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছি। এখন পর্যন্ত আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আমি সফলতার সঙ্গে পালন করছি। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি যা আজকে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস হিসেবে পরিচিত, এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১০ অক্টোবর, ১৯৯৬ সালে বাজুসের ইতিহাসের প্রথম নির্বাচনে আমি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সহসম্পাদক নির্বাচিত হই। আলম সাহেবের ইন্তেকালের পর ১০ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি।

প্রথম যখন সোনার ওপর আবগারি শুল্ক বসানো হয় আমরা তখন সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করি। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি, তাঁতীবাজার পোদ্দার সমিতি এবং স্বর্ণশিল্পী সমিতি মিলে আমরা নিজেরা একটা স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করি। সেই কমিটির কার্যকরী সদস্য হিসেবে আমরা আন্দোলন শুরু করি। অবস্থান ধর্মঘট, রাজস্ব ভবন ঘেরাও, সচিবালয়ে স্মারকলিপি প্রদানের পাশাপাশি দীর্ঘ নয় মাস সারা বাংলাদেশের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিই। এ আন্দোলন সংগ্রামে সর্বস্তরের জুয়েলারি শিল্পের লোকজন অংশগ্রহণ করেন। সদরঘাটের বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে আমরা মশালমিছিল বের করি; যার দৈর্ঘ্য ছিল প্রেস ক্লাব পর্যন্ত। আমার মনে হয় না বাংলাদেশের আর কোনো সংগঠন এরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করতে পেরেছে। আন্দোলনের শেষের দিকে এ শিল্পসংশ্লিষ্ট অনেকেরই আর্থিক টানাপোড়েন শুরু হয়। অর্থের অভাবে আমাদের দু-তিন জন স্বর্ণশিল্পী অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করলে সরকার আমাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। আমরা আবার ব্যবসা শুরু করি।

বাজুসের কার্যনির্বাহী কমিটির বিগত কয়েক মেয়াদে সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। আমি সোনাসংশ্লিষ্ট সব কমিটি এবং আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলাম। আমরা কখনো ধ্বংসাত্মক মনোভাব নিয়ে আন্দোলন করিনি। সব সময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছি বলেই সরকার আমাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। গঠনমূলক আন্দোলনের কারণে আমরা সরকারের কাছে যখন যা চেয়েছি তা-ই পেয়েছি।

আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে ভ্যাট। ৫ শতাংশ ভ্যাটহার আমাদের ওপর বোঝা; যার কারণে আমরা সফল হতে পারছি না। বেশির ভাগ সময় ক্রেতা এসে বলেন, 'আমরা ভ্যাট দেব না। কারণ ইন্ডিয়া, দুবাই, সৌদিতে ভ্যাট হার অনেক কম। এখানে ৫ শতাংশ ভ্যাট অনেক বেশি।' যার ফলে ক্রেতাসাধারণ বিদেশমুখী হয়ে যাচ্ছেন। আমি ১০০-এর বেশি স্বর্ণমেলায় অংশগ্রহণ করেছি। সব জায়গায় দেখেছি আমাদের হাতে তৈরি গহনার চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আমরা সঠিক নীতিমালার অভাবে রপ্তানি করতে পারছি না।

আমি একবার এক মেলায় প্রদর্শনীর জন্য স্বর্ণের অলংকার নিয়ে গিয়েছিলাম। যখন মেলা শুরু হলো তখন আমার গহনা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছিল এবং আমি বেশ কিছু অর্ডার পেয়েছিলাম। কিন্তু রপ্তানিতে অস্বাভাবিক করহারের কারণে শিপমেন্ট করতে পারিনি।

অনেকে মনে করেন আমরা সোনা ব্যবসায়ীরা অনেক ধনী। হ্যাঁ, আমরা রাজকীয় ব্যবসা করি; তার মানে এই নয় যে আমাদের অনেক টাকা, ধনসম্পদ বিদ্যমান আছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারসাম্যহীনতা, ডলার সংকট সব মিলিয়ে আমাদের ব্যবসার পরিস্থিতি খুবই নাজুক অবস্থানে আছে। আমাদের অনেক ব্যবসায়ীই আছেন যাদের বর্তমানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা।

একজন শিল্পী তৈরি হতে অনেক বছর লাগে। কিন্তু যখন তারা কাজের অভাবে এ শিল্পটাকে ছেড়ে দেন, অন্য দেশে মাইগ্রেট করেন, তখন এ দায় আমাদের ওপরই বর্তায়। নিজেদের তখন খুব অসহায় লাগে যে এত বছর এই ব্যবসাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থেকে কাউকে সাহায্য করতে পারি না।

আমরা স্বপ্ন দেখি স্বর্ণশিল্পে সুদিন আসবে, স্বপ্ন দেখি দিন বদলের। এ স্বপ্ন দেখানোর মূল কারিগর আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর। তাঁর নেতৃত্বে আমরা স্বপ্ন দেখছি বিশ্বদরবারে আবার বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল হবে। তাঁরই হাত ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথমবারের মতো বেসরকারিভাবে স্থাপিত হতে যাচ্ছে 'বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেড'। এবং বিশ্ববাজারে 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেখা সোনার বার রপ্তানি করা হবে।

কিন্তু সেজন্য আমাদের সরকারের তরফ থেকেও সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের দাবি খুব বেশি না। ভ্যাট কমানো, শিল্পসংশ্লিষ্ট কাঁচামালের ওপর আরোপিত শুল্ক কমানো, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক অবকাশ প্রদানসহ এ শিল্পকে বিশেষ শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা। এ দাবিগুলো মানা হলে এই সোনার বাংলাদেশকে একদিন আমরা সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিতে পারব ইনশা আল্লাহ।

আমার পথচলায় বাজুস

ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
সহ-সভাপতি, বাজুস

১৭ জুলাই, ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি-বাজুস প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সময় গড়িয়ে আজ বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন হয়ে ৫৮ বছরে পদার্পণ করল। নানার হাত ধরে স্বর্ণ ব্যবসার সঙ্গে আমার যোগাযোগ শুরু। ১৯৭২ সালে সেন্ট গ্রেগরী স্কুল থেকে ছুটির পর তাঁতীবাজারের দোকানে প্রায়ই উপস্থিত হতাম। পাকা স্বর্ণের কামি আর রুপার তাল নাড়াচাড়া করেই দোকানে সময় কাটত।

বাজুসের লাল কুঠির সভায় নানার সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। মনে আছে আবগারি শুল্কের প্রতিবাদে বিশাল মশালমিছিল আর নয় মাস দোকান বন্ধ রাখার কথা। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে নিউমার্কেটের পারিবারিক জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা শুরু করি; যা আজ অবধি চলছে।

১৯৯৪ সাল থেকে বাজুসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হই। ১৯৯৬ সালে জনাব এম এ হান্নান আজাদের হাত ধরে এম এ ওয়াদুদ খান-শামসুল আলম পরিষদের হয়ে সহসম্পাদক হিসেবে বাজুস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং নির্বাচিত হই। সাংগঠনিক নেতা হিসেবে বাজুসের সঙ্গে আমার পথচলা শুরু হয়।

বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণসহ ২০০৭ সালে ক্যাডমিয়াম পদ্ধতির প্রচলন এবং স্বর্ণমূল্য নির্ধারণ ফরমুলা উ দ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। পরবর্তীতে দিলীপ কুমার রায়-ডা. শাহীন পরিষদের হয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই।

ওই মেয়াদে বাজেটে আরোপিত ভ্যাট পরবর্তীতে এসআরও জারির মাধ্যমে কমানো হয় এবং বায়তুল মোকাররমে হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডবে আগুনে পুড়ে যাওয়া বাজুস অফিস পুনঃসজ্জিতকরণে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করি।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির মাননীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর নির্বাচিত হওয়ার পর বাজুসের কর্মকাণ্ডে অভাবনীয় গতি ফিরে এসেছে। তিনি ঐক্যবদ্ধ বাজুস গঠনের নিমিত্ত সমগ্র বাংলাদেশের জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের বাজুস পতাকাতলে সমবেত করেছেন। কেন্দ্রমুখী বাজুসকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। তিনি বাজুসের কার্যক্রম পরিচালনায় খাতভিত্তিক বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেছেন। এসব স্ট্যান্ডিং কমিটি মাননীয় প্রেসিডেন্টের নির্দেশনায় বিভিন্ন দিবস উদযাপন, জুয়েলারি মেলা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা, সভা-সেমিনার ইত্যাদি অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজন করে আসছে।

বাজুস আজ সমগ্র বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সমাজে ভিন্নমাত্রায় পরিচিতি লাভ করেছে। বাজুস দেশি ও বিদেশি বাজারকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করেছে। বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প একদিন বিশ্ব জয় করবে ইনশা আল্লাহ।

এক অনন্য উচ্চতায় বাজুস ও ফিরে দেখা অতীত

দিলীপ কুমার আগরওয়ালা
সাধারন সম্পাদক, বাজুস

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস তার প্রতিষ্ঠার ৫৮ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে এটা একদিকে যেমন আনন্দেও, ঠিক তেমনি গৌরবেরও বটে। প্রিয় বাণিজ্য সংগঠনের এই শুভক্ষণে বাজুসের একজন সদস্য হিসেবে গর্বিত বোধ করছি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা, দেশি স্বর্ণশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় বাজুসের কমিটি রয়েছে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করে কেন্দ্রীয় কমিটি। বর্তমানে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ৪০ হাজারের অধিক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আনুমানিক ৩০ লাখ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। সদস্যসংখ্যা ও প্রতিষ্ঠাকাল বিবেচনায় বাজুস এক অনন্য উচ্চতায় সমাসীন।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় এ দেশে সর্বত্র ক্যাডমিয়াম পদ্ধতি অর্থাৎ স্বর্ণালংকারের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে কঠোরভাবে ক্যারেটিং ও হলমার্ক পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। সময়টা ছিল ২০০৭ সালের ৭ মার্চ, অপেক্ষাকৃত নবীন ব্যবসায়ী এবং বাজুসের সদস্য হিসেবে আমার পথচলা শুরু। দেশের সামগ্রিক স্বর্ণের মানোন্নয়নে বাজুসের এ ধরনের সাফল্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীতে ব্যবসায়ী হিসেবে বিভিন্ন প্রতিকূলতা আমাকে আন্দোলিত করেছিল সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাবে এ দেশের বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় শিল্প যখন পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছিল, তখনই বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলে সূচিত হয়েছিল 'স্বর্ণ নীতিমালা'। মূলত বাজুসের জোর দাবি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা এবং নির্দেশনায় স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ অনুমোদিত হয়েছিল, রক্ষা পেয়েছিল এ দেশের সুপ্রাচীন জুয়েলারি শিল্প। সৃষ্টি হয়েছিল কর্মসংস্থান ও ঐতিহ্যের এক অবারিত সুযোগ। স্বর্ণ নীতিমালার ফলেই ইস্যু করা হয় গোল্ড ডিলারশিপ লাইসেন্স। এর ফলে এ দেশের সাধারণ জুয়েলার্সদের জুয়েলারি তৈরির কাঁচামাল গোল্ড আমদানির বৈধ ও বাণিজ্যিক দুয়ার উন্মোচিত হয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে 'স্বর্ণকর মেলা ২০১৯' আরও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলাদেশে এটাই প্রথম নজির যেখানে বাজুস এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর যৌথ উদ্যোগে নামমাত্র হারে কর নির্ধারণ করে অপ্রদর্শিত স্টক ঘোষণা করার সুযোগ দিয়েছিল। এর ফলে জাতীয় কোষাগারে জমা হয়েছিল প্রায় ৩০০ কোটি টাকা আর ২০ হাজার জুয়েলারি ব্যবসায়ী মুক্তি পেয়েছিলেন দীর্ঘদিনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে।

গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনের অনুমোদন বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক। মূলত গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনের ফলে এ দেশে স্বর্ণশিল্প পূর্ণতা পায়। আর এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ নিজ কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারির দিকপাল ও বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীরকে। এ ছাড়াও বাজুসের অফিস ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন, সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি, গ্রাহকসেবার আধুনিকায়নে বাজুস এখন এক দৃষ্টান্তের নাম।

আমার ১৮ বছরের এ পথচলায় যা কিছু অর্জন তার কৃতিত্ব বাজুসেরই। বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রতিষ্ঠার ৫৮ বছরে পদার্পণের এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্বপ্ন দেখি বাজুসের নেতৃত্বে এ দেশের জুয়েলারি শিল্প অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববাজারকে নেতৃত্ব দেবে আর বাংলাদেশের সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হবে আরও একটি ডায়মন্ড।

অলংকার ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন নির্দেশিকা-২০২৩

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমানে বাজুস ৪০ হাজার পরিবারের দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংগঠনে উন্নীত হয়েছে। বাজুসের মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা, স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং দেশি স্বর্ণশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা। আমরা বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বর্ণের মান ও দাম নির্ধারণ করে আসছি। জুয়েলারি শিল্পের ঐতিহ্য, ব্যবসায়িক সুনাম ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক দিক বিবেচনা করে অলংকার ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন নির্দেশিকা-২০২৩ গত ২৪ জুন জারি করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

সোনার অলংকার

১. স্বর্ণ নীতিমালা (২০১৮) ও সংশোধিত স্বর্ণ নীতিমালা (২০২১) মোতাবেক স্বর্ণের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হলমার্ক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই এ বিধান মেনে হলমার্ক নিশ্চিত করে গহনা বিক্রয়, বিপণন, প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে হবে।

২. একশ্রেণির অসাধু কারিগর/ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রলোভন ও অজুহাতে নিম্নমানের গহনা সাধারণ জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরবরাহ করে আসছেন। জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা আবার সরল বিশ্বাসে ক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি করছেন। ফলে একদিকে যেমন ভোক্তাসাধারণ প্রতারিত হচ্ছেন, অন্যদিকে ব্যবসার সুনামও নষ্ট হচ্ছে। তাই এ ধরনের নিম্নমানের গহনা প্রস্তুত, বিপণন ও বিক্রয় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোনো কারিগর/ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কাজে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে বিধি মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. ক্যাডমিয়াম পাইনের নামে নিম্নমানের কোনো গহনা প্রস্তুত, বিপণন ও বিক্রয় করা যাবে না। এ ধরনের গহনা প্রস্তুত, বিপণন ও বিক্রয়ের সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকবেন তাঁদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ক্রেতাসাধারণের কাছ থেকে ক্যাডমিয়াম গহনার মূল্য নিয়ে তাঁদের নিম্নমানের গহনা প্রদান করছেন, যেটা প্রতারণার শামিল এবং দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই জুয়েলারি ব্যবসার সুনাম ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে এ ধরনের প্রতারণামূলক কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. পাইন ঝালার কোনো অলংকার প্রস্তুত, বিপণন ও বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সনাতন পদ্ধতির অলংকার শুধু ক্রেতাসাধারণের কাছ থেকে কেনা যাবে।

৬. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে সোনার চারটি মান রয়েছে, যথাক্রমে ১৮, ২১, ২২ ও ২৪ (৯৯ দশমিক ৫) ক্যারেট। এ মানের বাইরে কোনো সোনা বা সোনার অলংকার বিক্রি করা যাবে না। এখানে উল্লেখ্য, তেজাবি স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা কোনো অবস্থাতেই ৯৯ দশমিক ৫-এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে সব হলমার্কিং কোম্পানিকে ওই নীতিমালা অনুযায়ী সোনা পরীক্ষা করতে হবে। উল্লেখ্য, সোনা বা সোনার অলংকারের গায়ে হাতে লেখা ক্যারেট সিল গ্রহণযোগ্য নয়।

৭. সোনার অলংকার এক্সচেঞ্জ বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ ও পারচেজ বা ক্রেতার কাছ থেকে কেনার ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বাদ দিতে হবে। এ ছাড়া সোনার অলংকার বিক্রির সময় ক্রেতাসাধারণের কাছ থেকে গ্রামপ্রতি কমপক্ষে বা ন্যূনতম ৩০০ টাকা মজুরি গ্রহণ করতে হবে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এ সিদ্ধান্ত অমান্য করে তাহলে ন্যূনতম ২৫ হাজার

টাকা জরিমান প্রদান করতে হবে। এর পরও যদি দ্বিতীয়বার এ আইন অমান্য করে তাহলে তার সদস্যপদ কেন বাতিল করা হবে না– এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিস প্রদান করা হবে। নোটিসের জবাব যদি সন্তোষজনক না হয় তাহলে বাজুসের শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. নিয়ম অনুযায়ী ক্রেতাসাধারণের থেকে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে নিজ দায়িত্বে জমা দিতে হবে। যদি কেউ এ নিয়ম অমান্য করে ভ্যাট ফাঁকি দেয় এবং ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহলে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করে বরং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৯. অর্ডারকৃত অলংকার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অথবা বুকিংকৃত অলংকার সরবরাহের ক্ষেত্রে যেদিন অর্ডার বা বুকিং দেওয়া হবে সেদিনের বাজারমূল্য কার্যকর হবে। অর্ডার সরবরাহ/গ্রহণের সময়সীমা সর্বোচ্চ এক মাস হবে। এক মাস পার হলে অর্ডারটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে বায়না/অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত টাকা/সোনা থেকে ১০% বাদ দিয়ে ক্রেতাসাধারণকে বাকি টাকা/সোনা ফেরত দিতে হবে।

১০. ক্রেতাসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য সোনার অলংকার বিক্রির সময় কোনো প্রকার প্রলোভনমূলক উপহার প্রদান বা মূল্যছাড়/মজুরি ছাড়/ভ্যাট ছাড় দেওয়া যাবে না।

১১. বাজুস কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে সোনা বা রুপার গহনা বিক্রি করা যাবে না। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটায় তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানাসহ প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুরনো সোনা ক্রয় সংক্রান্ত

১২. পুরনো সোনা কেনার ক্ষেত্রে নির্দেশনা নিম্নরূপ :

ক. পুরনো সোনা কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিক্রেতাকে পারচেজ রসিদ প্রদান করতে হবে।

খ. সংশ্লিষ্ট জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের পারচেজ রসিদে বিক্রেতার যাবতীয় তথ্যাদি যেমন নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে।

গ. বিক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি থেকে নিজ দায়িত্বে উভয় পাশের ফটোকপি রাখতে হবে।

ঘ. মূল মালিক ছাড়া কোনো প্রতিনিধির কাছ থেকে অলংকার কেনা যাবে না।

ব্যাগেজ রুলের আওতায় আনা সোনা ও অলংকার ক্রয় সংক্রান্ত

১৩. ব্যাগেজ রুলের আওতায় আনয়নকৃত সোনা ও অলংকার কেনার ক্ষেত্রে নির্দেশনা নিম্নরূপ :

ক. বিক্রেতার পাসপোর্টের মূল কপি থেকে নিজ দায়িত্বে ফটোকপি করে রাখতে হবে।

খ. বিক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি থেকে নিজ দায়িত্বে উভয় পাশের ফটোকপি রাখতে হবে।

গ. প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে সোনা কিনতে হবে।

ঘ. এয়ারপোর্টে ডিক্লেয়ারেশন/ট্যাক্সের আওতায় থাকলে ট্যাক্স প্রদানের ডাকুমেন্ট (মূল কপি) সংরক্ষণ করতে হবে।

ডায়মন্ডের অলংকার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত

১৪. ডায়মন্ড অলংকার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশিকা :

ক. ১ থেকে ৫০ সেন্টের মধ্যে সব ডায়মন্ডের গহনার ক্ষেত্রে কালার ও ক্ল্যারিটি সর্বনিম্ন মানদণ্ড হবে (IJ/আইজে) ও (SI-2/এসআই-টু)।

খ. ৫০ সেন্টের ওপরে সব ডায়মন্ডের গহনার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে।

গ. ডায়মন্ডের গহনায় স্বর্ণের সর্বনিম্ন মানদণ্ড ১৮ ক্যারেট। অর্থাৎ ডায়মন্ডের গহনায় ১৮ ক্যারেটের নিচের মানের স্বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ. ডায়মন্ডের অলংকার বিক্রির সময় বাধ্যতামূলক ক্যাশমেমোয় গুণগত মান নির্দেশক 4C (Color, Clarity, Cut, Carat) উল্লেখ করতে হবে।

ঙ. ডায়মন্ডের অলংকার এক্সচেঞ্জ বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এবং পারচেজ বা ক্রেতার কাছ থেকে কেনার ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ বাদ দিতে হবে।

চ. ক্রেতাসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য ডায়মন্ড অলংকার বিক্রির সময় কোনো প্রকার প্রলোভনমূলক উপহারসামগ্রী বা একটা কিনলে একটা ফ্রি এ ধরনের অফার প্রদান করা যাবে না। এ নির্দেশের ব্যত্যয় ঘটলে ওই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ বাতিল এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছ. কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে আসল ডায়মন্ডের নামে নকল ডায়মন্ড (মেসোনাইট, সিভিডি, ল্যাব মেইড, ল্যাব বর্ন ইত্যাদি) বিক্রি করলে ওই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ বাতিল এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জ. ডায়মন্ডের গহনার মান নিশ্চিতকরণে মানসম্পন্ন ডায়মন্ড ল্যাবের সনদ থাকতে হবে।

ঝ. ডায়মন্ড অলংকার বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫% ডিসকাউন্ট প্রদান করা যাবে। যদি কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান এ নিয়ম অমান্য করে তাহলে ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা জরিমানাসহ বিধি মোতাবেক সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রুপার অলংকার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত

১৫. ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকল্পে সোনার অলংকারের ন্যায় রুপার অলংকারে বাধ্যতামূলক হলমার্ক থাকতে হবে।

১৬. বিক্রির ক্ষেত্রে ক্যাশমেমোয় অবশ্যই ক্যারেট ও ওজন উল্লেখ থাকতে হবে। তবে মেশিন মেইড আমদানিকৃত রুপার অলংকারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী অলংকারের মান নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবেন।

১৭. রুপার অলংকার এক্সচেঞ্জ বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ এবং পারচেজ বা ক্রেতার কাছ থেকে কেনার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ বাদ দিতে হবে।

১৮. ভোক্তা অধিকার ও প্রতারণা রোধে রুপার অলংকারের ডিসপ্লেতে কোনোক্রমেই ইমিটেশন/মেটাল/গোল্ড প্লেটকৃত জুয়েলারি রাখা যাবে না। ইমিটেশন/মেটাল/গোল্ড প্লেটকৃত জুয়েলারি আলাদা ডিসপ্লেতে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডিসপ্লেতে বড় ও স্পষ্ট অক্ষরে জুয়েলারির ধরন উল্লেখ করতে হবে।

১৯. কোনো জুয়েলারি ব্যবসায়ী বা বাজুস সদস্য ক্রেতাসাধারণের কাছে ইমিটেশন/মেটাল/গোল্ড প্লেটকৃত অলংকার রুপা অলংকার বলে বিক্রি করলে ওই সদস্যের সদস্যপদ বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০. বাজুস কর্তৃক সারা দেশে রুপার চারটি মান নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১৮, ২১, ২২ (ক্যারেট ক্যাডমিয়াম) ও সনাতন (সনাতনে ১০ আনা জমা থাকতে হবে)। এ মানের বাইরে কোনো রুপার অলংকার বিক্রি করা যাবে না।

২১. রুপার অলংকার বিক্রির সময় ক্রেতাসাধারণের কাছে গ্রামপ্রতি ২৬ টাকা মজুরি গ্রহণ করা যাবে।

সরকারি আইন ও নির্দেশনা

২২. সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে জুয়েলারি ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে।

২৩. Gold (Procurement, Storage & Distribution) ১৯৮৭-এর আওতায় জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ডিলিং লাইসেন্স গ্রহণ করে বৈধভাবে জুয়েলারি ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ডিলিং লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে।

২৪. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভ্যাট নিবন্ধন থাকতে হবে। তাই ভ্যাট নিবন্ধন করে নিবন্ধন সনদ (BIN) প্রতিষ্ঠান বা শোরুমের ভিতরে প্রদর্শন করতে হবে।

২৫. সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নামে টিআইএন সনদ থাকতে হবে এবং শোরুমের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

২৬. ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত ও আইনি ঝামেলা এড়াতে নিজ দায়িত্বে বিএসটিআই থেকে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ওজন পরিমাপক যন্ত্র পরীক্ষা করে স্টিকার ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে।

২৭. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে মূল্যবান ধাতু এবং মূল্যবান পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আখ্যায়িত করেছে। এজন্য কোনো গ্রাহক মূল্যবান ধাতু ও পাথর কেনাবেচার সময় ১০ লাখ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ নগদ টাকার লেনদেন করলে বিএফআইইউ বরাবর গ্রাহকের লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিএফআইইউয়ের ওয়েবসাইটে (https://www.bfiu.org.bd) বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

বাজুসের নির্দেশনা

২৮. বাজুসের নিয়ম অনুযায়ী সদস্যভুক্ত সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক বাজুসের স্টিকার ও হালনাগাদ সনদপত্র শোরুমের ভিতরে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

২৯. বাজুসের সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানে স্টিকার, সনদপত্র ও আইডি কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এ বাবদ ঢাকা মহানগরের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে ফি ধার্য করা হয়েছে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশ) টাকা। উল্লেখ্য, জেলা ও উপজেলা শাখায় রসিদের মাধ্যমে ৫০০ (পাঁচ শ) টাকা জমা রাখবেন এবং বাকি ১,০০০ (এক হাজার) টাকা বাজুস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রদান করে রসিদ সংগ্রহ করবেন।

৩০. বাজুসের ভর্তি ফি ঢাকা মহানগরের আওতাধীন জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০,০০০ (দশ হাজার) এবং ঢাকা মহানগর ছাড়া সারা দেশের জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩১. কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে মিল রেখে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম বা নামের আগে-পরে 'নিউ', 'দি' বা অন্য কিছু বা বিদেশি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের নাম সংযুক্ত করে নতুন কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যাবে না। কোনো জুয়েলারি ব্যবসায়ী যদি এ নিয়ম অমান্য করে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন তাহলে তাঁর প্রতিষ্ঠানকে বাজুসের সদস্যভুক্ত করা হবে না।

৩২. নতুন প্রতিষ্ঠানের নামকরণের আগে বাজুসের কাছ থেকে নামের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৩৩. কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান যদি অন্য কোনো জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নিয়োগ দিতে চান, তাহলে ওই কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পূর্ববর্তী দোকানের ছাড়পত্র (অনাপত্তি পত্র) প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়োগ প্রদান করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৪. সোনার অলংকার পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের চালানের কপি বাধ্যতামূলকভাবে বহনকারীর সঙ্গে রাখতে হবে। উল্লেখ্য, চালানে বহনকারীর নাম, মোবাইল নম্বর, সোনার ওজন, সংখ্যা ও গন্তব্য অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে এবং বহনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকতে হবে।

এ অবস্থায় ব্যবসায়িক সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে বাজুস প্রণীত উল্লিখিত বিধিবিধান ও সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে যথাযথভাবে ব্যবসাকার্য পরিচালনা করার অনুরোধ করা হলো।

অলংকার ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন নির্দেশিকা-২০২৩ অমান্যকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে অবহিত করা হবে।

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল এন্ড মেম্বারশিপ

চেয়ারম্যান
এম. এ. ওয়াদুদ খান
০১৭১০৮৫০৮২৫

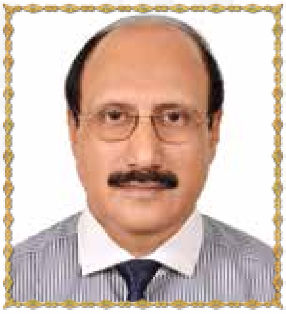

ভাইস চেয়ারম্যান
মাসুদুর রহমান
০১৭১১৪৩৯৫৯৫

সদস্য সচিব
মোঃ রিপনুল হাসান
০১৭১১৩০৮৮৮৫

সদস্য

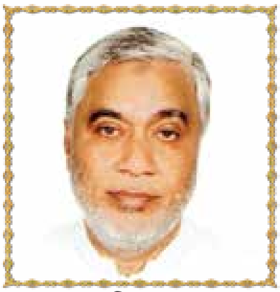

মোঃ সহিদুর রহমান
০১৯৭০০১১৯১৯

কাজী এমদাদুল হক
০১৮৪২৮০০৬৬৪

গোপাল পাল
০১৭১২৭৫৮৬৩২

মোঃ আনোয়ার হোসেন (কুদ্দুস)
০১৭১৫৯৩৯৬০০

শিবু প্রসাদ মজুমদার
০১৭১২৫৩৮৯৭৬

শাওন সাহা
০১৭৭৭৩৫৩৫৭২

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক মনিটরিং

চেয়ারম্যান

ডাঃ দিলীপ কুমার রায়
০১৭১২০৬৬৯২৩

ভাইস চেয়ারম্যান

আনোয়ার হোসেন
০১৭১৩০০৯৭৯১

সদস্য সচিব

মোঃ জয়নাল আবেদীন খোকন
০১৮৬৬৭৭৭৭৭৪

সদস্য

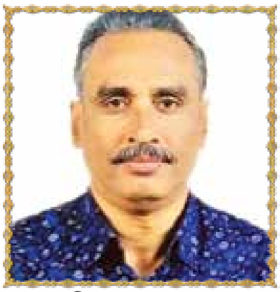

পবিত্র চন্দ্র ঘোষ
০১৮১৭৫৭২৫৪০

রকিবুল ইসলাম চৌধুরী
০১৭৩১১৪১৬৭৫

মোঃ এনামুল হক সোহেল
০১৭১২০৮০৯৯৫

চন্দন কুমার ঘোষ
০১৭১৭৪৭৬৫২০

প্রণব সাহা
০১৮১৯৬৩৭১৭৬

নীহার কুমার রায়
০১৭১১৯২০৬৫৩

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ব্যাংকিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

চেয়ারম্যান

গুলজার আহমেদ
০১৭১১৫৯০৩৭০

ভাইস চেয়ারম্যান

মুক্তা ঘোষ

সদস্য সচিব

আশিষ কুমার মন্ডল
০১৮১৯২২৬৭৫৩

সদস্য

মোঃ ইমরান চৌধুরী
০১৭১১৫৩২০০৮

তাজুল ইসলাম দেওয়ান
০১৭৬৮৩৮৫৫৬৬

আনিসুর রহমান লাবু
০১৮১৯৪৯৯৮৫৮

মোঃ সামসুল হক ভূইয়া
০১৬৭৩৯০০১৩৯

সমীর রায়
০১৮১৯২৬৯২৪৯

গৌতম ঘোষ
০১৭১১৫৩০১৮৩

বৃন্দাবন দাস
০১৭৪০৪০১০৬০

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ এন্ড ট্যাক্সেশন

চেয়ারম্যান

আনোয়ার হোসেন
০১৭১৩০০৯৭৯১

ভাইস চেয়ারম্যান

সমিত ঘোষ অপু
০১৭১৫৯৪০৩৭৫

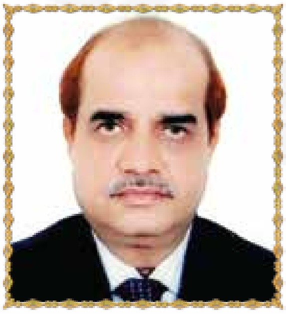

সদস্য সচিব

পবন কুমার আগরওয়াল
০১৭১১৫২৪৯৫৫

সদস্য

মোঃ মজিবর রহমান খান
০১৭১৩০১৩২৯৯

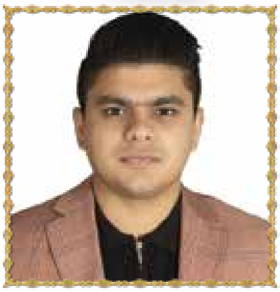

মোঃ আসলাম খান
০১৭২৬২২২৯৪০

মিজানুর রহমান
০১৭১১৫২২১৬০

মোঃ আব্দুল হালিম মামুন
০১৭০৭০৭৭৬৮৭

মীর খালেদ হোসেন (বাবু)
০১৭১১৫৪১৭৪৪

মোঃ আলী হোসেন
০১৮১৯২৫২৯১৬

নাজমুদ্দিন মোহাম্মদ ফয়সাল
০১৭১৫২৩৩৩৬২

হাজী মোঃ হারুন উর রশিদ
০১৭১১১৫৪৩১১

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং এন্ড প্রাইস মনিটরিং

চেয়ারম্যান
এম. এ. হান্নান আজাদ
০১৭১১৫৩০৪৭৫

ভাইস চেয়ারম্যান
এনামুল হক ভূইয়া লিটন
০১৭১৩০০৯৯৮৩

সদস্য সচিব
বাবলু দত্ত
০১৭১২১৬৬১৬২

সদস্য

কার্ত্তিক কর্মকার
০১৭১১৫৩৯৯৮৬

আবু নাসের মোঃ আবদুল্লাহ
০১৯২৫৬১৩১৫০

বিমল চন্দ্র ঘোষ
০১৭৫৮৯৩৯৯৯৮

আশুতোষ দত্ত
০১৭১১১০৮৫৯০

উত্তম কুমার সাহা
০১৭১১২৩৬৪৫৭

নারায়ণ চন্দ্র পাল
০১৭১১৪০৯৭০৫

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট

চেয়ারম্যান

বাদল চন্দ্র রায়
০১৮১৯২১৭৭৭৭

ভাইস চেয়ারম্যান

মোঃ তাজুল ইসলাম (লাভলু)
০১৭১১৫২৭২২৬

সদস্য সচিব

জয়দেব সাহা
০১৮১৯২২০৯৭৭

সদস্য

কাজী নাজনীন হোসেন জারা

এম. এম. এ. বাশার
০১৭১১৫৬৬০১৭

শাওন আহমেদ চৌধুরী
০১৭১৪২০৯০০২

পলাশ সাহা
০১৭১০৯০১৪১৪

তপন মল্লিক
০১৭১৫০৬৪০৮৭

নেসার আহমেদ
০১৭১১৯৮৬৩১০

মোঃ রেজাউল করিম
০১৭২০০৬১৩৩২

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন এন্ড সোস্যাল অ্যাফেয়ার্স

চেয়ারম্যান

ডাঃ দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
০১৮১৭৫৩৮৮৭৮

ভাইস চেয়ারম্যান

মোঃ লিটন হাওলাদার
০১৭১৫০১১২২৬

সদস্য সচিব

মিজানুর রহমান মানিক
০১৯০২৬০৮৫৭৪

সদস্য

মোঃ সেলিম
০১৫৫২৫৭৯৩৫১

সজল মাহমুদ
০১৭১১৩৫২৮৯২

মোঃ রোকন উদ্দিন
০১৭৩০৬৪৪৭৮৮

উত্তম কুমার পাল
০১৮১৯১৫২২৯২

রনজিৎ পাল
০১৮১৭৫৭০১৩৪

রাহুল সাহা
০১৭১১৯০৫৪০৭

মোঃ নাজমুল হুদা লতিফ
০১৮১৯৪৪১১০৮

বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ
০১৯১১৩২০৩৮৭

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট

চেয়ারম্যান

কাজী নাজনীন ইসলাম

ভাইস চেয়ারম্যান

মোঃ শহিদুল ইসলাম
০১৭১৩০৬৩৬৩০

সদস্য সচিব

অমিত সাহা
০১৭৭০০১৬৪৬৩

সদস্য

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
০১৭৮২৬৮৯২৪৯

মোঃ নয়ন চৌধুরী
০১৭১৫০৪১১৭০

আব্দুস সোবাহান
০১৯৭১৫৬৭৯৪৫

বিজন কুমার সেন
০১৭২০১৩২৪২৭

রাজিব ইকবাল
০১৭১০৩৯৭৫১৫

মোঃ আবুল কালাম
০১৭১১৯৫৪৫৪৭

বরুন কর্মকার
০১৮৫৯৫৪৭৭৬৫

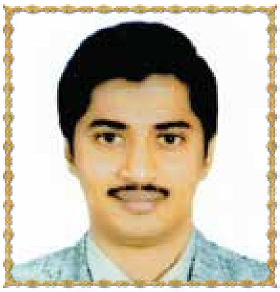

আব্দুর রহমান
০১৯০৯০৩৭০৫৫

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এন্টি স্মাগলিং এন্ড ল এনফোর্সমেন্ট

ভাইস চেয়ারম্যান

বিধান মালাকার
০১৭১১৫২৭৪৭৫

সদস্য সচিব

ইকবাল উদ্দিন
০১৭১১৫৬৪৯৪০

সদস্য

রঞ্জন বিশ্বাস
০১৭১১৫৩০৫২৯

মোঃ ইউসুফ শরীফ
০১৩১৬৫৭০৬৩০

বিপুল ঘোষ শংকর
০১৭১৪০০৫০৯২

কামাল জামান মোল্লা
০১৯১৫৫১১১১১

বিকাশ ঘোষ
০১৯৩৬৫১৩৪৫৪

স্বপন চন্দ্র কর্মকার
০১৭১২০১৬৩৬৬

নজরুল ইসলাম
০১৭১১৫২০৫৯০

মোঃ বাবুল রহমান
০১৯১৯০১৬৩০৩

সত্য রঞ্জন ব্রহ্ম
০১৮১১৪৪৪১১১

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এক্সিবিশন, ট্রেড এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

চেয়ারম্যান

উত্তম বণিক

০১৯২৬৭৬৭৬৭৬

ভাইস চেয়ারম্যান

নারায়ণ চন্দ্র দে

০১৭১৪০৪৭৭৬২

সদস্য সচিব

উত্তম ঘোষ

০১৭১১৫৩৩৬০৯

সদস্য

মোস্তফা কামাল

০১৮১১৪৮৩০০৫

শ্রীবাস রায়

০১৭১৫০৫০০৮১

আসিফ ইকবাল

০১৭৫৭৮৪৮২৬২

গনেশ দেবনাথ

০১৭৪৮৩১৭০০৪

মোঃ মনির হোসেন

০১৭১৫০২৫৩০১

তানভীর রহমান

০১৮১৯২৪৪৪৬৪

মোঃ আজাদ হোসেন

০১৭১৬১৮২৯৫৯

কনক বিশ্বাস

০১৭২৬৬৬৪৪২২

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ওমেন অ্যাফেয়ার্স

চেয়ারম্যান

ফরিদা হোসেন

ভাইস চেয়ারম্যান

সোহানা রউফ চৌধুরী

সদস্য সচিব

শাহানা বেগম

সদস্য

তাহমিনা এনায়েত

তাসনিম নাজ মোনা

ডলি কর্মকার

কোহিনুর আক্তার চৌধুরী

মিসেস আফরিনা হাসনাত

সুলতানা রাজিয়া

শাবানা পারভীন

প্রতিমা সাহা

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইয়ং এন্ট্রাপ্রেনার্স

চেয়ারম্যান

আজাদ আহমেদ
০১৭১৩০৪৬৫৭৮

ভাইস চেয়ারম্যান

নিয়াজ আকবর খান
০১৯১৯০৯৯৯৯৯

সদস্য সচিব

মোঃ ফেরদৌস আলম শাহীন
০১৯১১৩৮১৩৯৫

সদস্য

অমিত ঘোষ
০১৭৪৬৬৮৮৫২৫

স্বরূপ দে
০১৮৪১৮২০০৯১

মোঃ সাইদুল ইসলাম
০১৭৯৬৫৯০৭৭৭

মোঃ রুবেল
০১৭৩৩৯৫৯৫৯৬

সৌমেন নাগ
০১৮১৫৮৪৬৭৪৭

প্রাণ গোবিন্দ হালদার
০১৭১৫০১৬৬৭০

অর্জুন কুমার পাল
০১৭১৬১৭১২৯৮

সোনাতন চন্দ্র কর্মকার
০১৭৮২২৩৯০০৯

অর্থ কমিটি

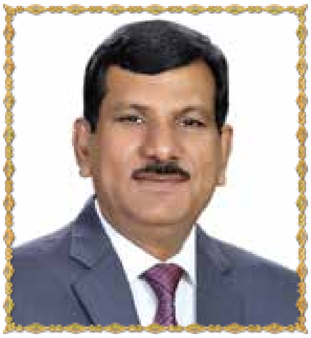

প্রধান

ডাঃ দিলীপ কুমার রায়

০১৭১২০৬৬৯২৩

সদস্য

আনোয়ার হোসেন

০১৭১৩০০৯৭৯১

সদস্য

উত্তম বণিক

০১৯২৬৭৬৭৬৭৬

সালিশ কমিটি

প্রধান

ডাঃ দিলীপ কুমার রায়

০১৭১২০৬৬৯২৩

সদস্য

গুলজার আহমেদ

০১৭১১৫৯০৩৭০

সদস্য ও প্যানেল ল'ইয়ার

অ্যাড. মোঃ শাহজানান ফিরোজ (তুহিন)

BANGLADESH JEWELLER'S ASSOCIATION
বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন

প্রধান কার্যালয়:
লেভেল-১৯, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১০১২, হটলাইন: +৮৮ ০৯৬১২১২০২০২
ইমেইল: info@bajus.org, ওয়েবসাইট: www.bajus.org